মেদিনীপুর কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম, এ প্রণীত।

কলিকাতা,

উইলিয়মস্ লেন ৪ নং ভবনস্থ

দাস যন্ত্রে,

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত,

ও

১০৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট "স্কলার্স রিপজিটরী" হইতে

শ্রীশরৎচন্দ্র দের দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।
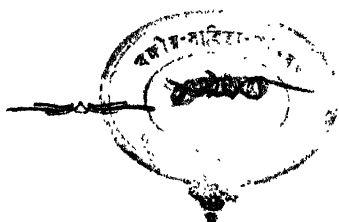
পরলোকগতা, পুত্রবৎসলা, স্নেহময়ী

জননীর উদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর, ও বিদুষী শ্রীমতী বেশান্ত মেদিনীপুর সহরে আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আমি এই সকল হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার সারভাগ 'নোট' করিয়া রাখি। পরে সাবকাশমত সেই 'নোট' দৃষ্টে বর্দ্ধিত-কলেবর প্রবন্ধ রচনা করিয়া "দর্শক" ও "বার্ত্তাবহ" নামক চুঁচুড়ার দুইখানি সংবাদপত্রে সেই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করি। "তুলসী-মালা" নাম দিয়া সেই প্রবন্ধগুলি আজ জনসমাজে প্রচার করিলাম। ভরসা করি, বিদ্যোৎসাহী হিন্দু ভ্রাতাগণ "তুলসী-মালার" আদর করিয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, এবং এই অকিঞ্চন গ্রন্থকারের উৎসাহবর্দ্ধন করিবেন।

মেদিনীপুর।
সন ১৩০৪ সাল;
১লা পৌষ।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

সূচীপত্র।

তুলসী-মালা।

ধর্ম্মের প্রয়োজন।

(১)

'ধর্ম্মের প্রয়োজন কি' বলিতে হইলে, অগ্রে বলা আবশ্যক—'ধর্ম্ম কি' ? 'ধর্ম্ম কি'—আগে না জানিলে, 'ধর্ম্মের প্রয়োজন কি'—একথা কেমন করিয়া বুঝিব ? অতএব প্রথমে দেখা যাউক—ধর্ম্ম কি বা কাহাকে ধর্ম্ম বলে। জৈমিনী ঋষি পূর্ব্ব-মীমাংসা শাস্ত্রে বলিয়াছেন, বিহিত ক্রিয়ার নাম ধর্ম্ম ; শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলেই ধর্ম্ম হয়। ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। তার পর কণাদ বৈশেষিক দর্শনে বলিয়াছেন, আত্মার কতকগুলি শক্তি আছে, যথা ভক্তি, প্রীতি, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সংযম ইত্যাদি। এই গুলির সমষ্টির নাম ধর্ম্ম। জৈমিনীর মত ও কণাদের মত আপাততঃ বিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। দেখা যাইতেছে, শক্তি ও অনুষ্ঠান, এই দুই কথা। শক্তি থাকা চাই তবে ত অনুষ্ঠান হইবে ; শক্তি না থাকিলে অনুষ্ঠান হইতে পারে না, আর অনুষ্ঠান না হইলে ধর্ম্ম হইবে না। তবেই দেখা গেল ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটীই অত্যাবশ্যক ; একটীর অভাবে অপরটী থাকিতে পারে না। তাই জৈমিনী বলিলেন অনুষ্ঠানটীই ধর্ম্ম ; আর

কণাদ বলিলেন, যে শক্তি দ্বারা অনুষ্ঠান হইবে সেইটিই ধর্ম্ম। এখন বৈয়াকরণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলেন শুনা যাউক। ধর্ম্ম শব্দ ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা, কোন বস্তুকে নিজ স্থানে স্থির করিয়া রাখা। ঘটনাপ্রবাহ ছুটিতেছে; কালস্রোতের বেগ একটানা বহিয়া চলিয়াছে; অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ এ প্রবাহে ভাসমান। বেগপ্রবাহে ভাসমান বস্তুনিচয়কে একস্থানে বা পূর্ব্বস্থানে অবস্থাপিত করা ধর্ম্মের কাজ। ধর্ম্ম না থাকিলে, ঘটনাপ্রবাহ এ জগৎকে ধ্বংসার্ণবে কোন্ কালে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। ধর্ম্ম আছে বলিয়া এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাঁড়াইয়া আছে। ধর্ম্মের বেগ, কালের বেগকে প্রতিহত করিতেছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে লৌকিক ব্যবহার কি? সাধারণে ধর্ম্ম বলিলে কি বুঝে? তুমি কুকার্য্য করিতে যাইতেছ, এমন সময় তোমার অন্তরাত্মা প্রাণের নিভৃত স্থানে থাকিয়া নিষেধ বাক্যে বলিল, "ওকাজ করিও না—করিতে নাই, করিলে পাপ হয়।" আবার কখনও সেই অন্তরাত্মা ভাল কাজ করিবার সময় তোমায় প্ররোচনা করিবে, বলিবে—"কর, উহা সৎকার্য্য, করিলে পুণ্য হইবে।" অন্তরাত্মার বশে চলিলেই মঙ্গল—আনন্দ; না চলিলেই বিপদ—দুঃখ। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Conscience বলে।

দেখা গেল, সকল মতেরই সামঞ্জস্য আছে, মূলে বিরোধ নাই। আত্মা দেহের মধ্যে আছেন। যেমন দেহে নানা গুণ আছে, আত্মাতেও অনেক গুণ আছে। আত্মার গুণগুলি শক্তি। সেই গুণের শক্তি বাহিরে ফোটে, দেহে প্রকাশ পায়। কণাদ ঋষির মতে এই ধর্ম্মবীজ আত্মাতে নিহিত আছে। ঐ সকল ধর্ম্মবীজ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অঙ্কুরিত হয়, বৃক্ষে পরিণত হয়। পরে ধর্ম্ম-

বৃক্ষ ফলফুলে সুশোভিত হয়। এই সকল ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ বীজের জন্য ক্ষেত্র আবশ্যক, সুতরাং দেহ আবশ্যক। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি। আত্মা ধর্ম্মবীজের কোষ মাত্র। সেই কোষস্থিত বীজের নিমিত্ত, দেহরূপ ক্ষেত্রের আবশ্যক। কর্ম্মবারি-সিঞ্চনে বীজের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও অঙ্কুর হয়। কর্ম্ম করিতে হয় বলিয়াই আত্মার দেহ-ক্ষেত্রের প্রয়োজন। এখন দেহের আবশ্য-কতা বুঝিলাম। ধর্ম্মের সহিত দেহের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। দেহটা কি? উত্তর—যন্ত্রসমষ্টি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এইরূপ ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। তাহা ছাড়া মন আছে। কি কি উপাদানে জীব-শরীর গঠিত হইয়াছে, জান? অস্থি, মাংস, স্নায়ু, শোণিত ইত্যাদি। শাকান্ন ভোজন করিয়া দেহ। পঞ্চভূতে গঠিত এই দেহ ধারণ করিতে হয়, রক্ষা করিতে হয়, ইহার পুষ্টি সাধন করিতে হয়। সে জন্য উপ-যুক্ত আহার যেরূপ আবশ্যক, অঙ্গচালনাও সেইরূপ আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্যশিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের চক্ষু আছে সত্য, কিন্তু আমরা কয় জন দেখিতে জানি? আমাদের কর্ণ আছে এই মাত্র, কিন্তু আমরা কি শুনিতে শিখিয়াছি? সেইরূপ আমা-দের আস্বাদন, স্পর্শ ও ঘ্রাণশক্তি নাই বলিলেই হয়। যাহা আছে, তাহা অতি স্থূল রকমের। ফলে, আমরা খেতে, শুতে শুনিতে, চলিতে, বলিতে, দাঁড়াতে কিছুই শিখি নাই।

এক জন চাষার ছেলে পাতা দেখিয়া বলিতে পারিবে, কোন্ গাছে সরু ধান, কোন্ গাছে মোটা ধান হইবে। কাহার কি ঘ্রাণ, তুমি আমি তাহা জানি কি, অথবা বলিতে পারিব কি? এক জন ফুল মালী যেমন দেখিতে শিখিয়াছে, আমরা সেরূপ দেখিতে

শিখি নাই,—অভ্যাস করি নাই। এক জন গায়ক সুরের ভেদা-ভেদ, অতি সূক্ষ্ম তারতম্য উপলব্ধি করিতে পারেন; তুমি কি সুরের বা স্বরের ভেদাভেদ চিন? তাই বলিতেছিলাম, ধর্ম্ম-সাধনের জন্য দেহ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে, মন ও ইন্দ্রিয়গণের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে, তাহাদের চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। এ সকল কার্য্যে শিক্ষার প্রয়োজন। সাবধানে থাকিলেও নানা কারণে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়গণ মলিন, অবসন্ন, ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। অভ্যা-সের দোষে, শিক্ষার দোষে, অনেক শক্তি লোপ পায়, যন্ত্রের অনেক স্থানে মরিচা ধরে। তাহাতে উন্নতি না হইয়া আমাদের অবনতি হইতে থাকে। আর্য্যেরা পূর্ব্বে পূর্ণায়তন দেহে স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেন। তাঁহাদের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সকল ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি, সকল শক্তি পূর্ণায়তন ছিল; এখন নাই। মেধা, স্মৃতি, কল্পনা, দয়া, ধৃতি, উপরতি, বিচারশক্তি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির এক একটী ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ছিল।

তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, মস্তিষ্কে ৭৩টী স্বতন্ত্র যন্ত্র ছিল; এখন সে সবগুলি নাই, কতকগুলি আছে মাত্র। ইংরাজগণ বলেন, কেবল ৪৮টী যন্ত্র মস্তিষ্কে আছে। চক্ষে দর্শনের কার্য্য হয়। চক্ষুর ৩৯টী স্বতন্ত্র শক্তি আছে, অর্থাৎ ৩৯ ভাবে দেখা যায়, ৩৯ প্রকারের জ্ঞান একা দৃষ্টিযন্ত্রে উপলব্ধি হইতে পারে। এ সকল এখন উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সামগ্রী, অনেক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাহার কারণ, আমাদের জাতিগত ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে। মা বাপের দোষ সন্তানে বর্ত্তে। মা বাপের শারীরিক অঙ্গহীনতা ঘটিলে, সন্তানও অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ জীব হইবে। পারদদোষ, উপদংশ বীজ বা

বস্তাবীজ অনুক্রামিক বটে। ধর্ম্মভাব ও অধর্ম্মভাবও ঐরূপ। গরুর গাত্র শাদা লোমে আবৃত; বানরের লেজ আছে; কুকুর শৃগাল বিড়াল ইহারা নিকৃষ্ট জন্তু। মানব নিকৃষ্ট জন্তু হইতে পৃথক্। সে পার্থক্য বাহ্যিক আকারগত এবং আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয় ও শক্তিগত। আমাদের যে যে যন্ত্র আছে, যে যে শক্তি আছে, নিকৃষ্ট জন্তুর সে সে যন্ত্রের অভাব, সে সে শক্তির অভাব। ফলে, আমাদের যাহা আছে, তাহাদের তাহা নাই, তাহাদের যাহা আছে, আমাদের তাহা নাই। বানরের লেজ আছে, মানুষের লেজ নাই। তবে মানুষের লেজ যে একেবারে নাই তাহা নহে। মেরুদণ্ডের শেষ অস্থি Coccyx—উহাই বানরের লেজের অনুকারী। উহাতে এক একখানি হাড় গজাইয়া লম্বা হইলেই লেজ হইল।

আকারে ও গঠন ভেদে, ইন্দ্রিয় ও শক্তি ভেদে, আচার ও আহার ভেদে, দেশ কাল পাত্র ও অবস্থা ভেদে এই সকল তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এখন আমাদের দেশে আর্য্যজাতির অবনতির দশা। এ অবনতি দুই এক বৎসরের নহে। বহু বৎসরে এই অবনতি ঘটিয়াছে। ক্রমোন্নতিও একবারে ঘটে নাই। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে একথা পরিষ্কার বুঝা যায়। প্রথম সৃষ্টিকালে ভগবান ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বীজাকারে ইন্দ্রিয়গণ অনন্ত আকাশে ভাসিতে লাগিল। তাহারা অতৃপ্ত। সেই জন্য ভগবানকে মিনতি করিয়া বলিল, "হে ভগবন, আমাদের ভোগ আয়তন দেহ দাও, নতুবা আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না।" তখন ভগবান তাহাদের গো-দেহ প্রদান করিলেন। কিছু কাল পরে তাহারা পুনরায় জানাইল, "এ গো-দেহে আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না। গো-দেহ অপেক্ষা উচ্চ দেহ দাও।

তখন অশ্ব-দেহ দেওয়া হইল। আবার তাহারা কাঁদিয়া বলিল, "ভগবন্, অশ্বদেহে তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব আমাদের ইহা অপেক্ষা উন্নত দেহ দাও"। পরে মানবদেহ দেওয়া হইল। তাই মানব শ্রেষ্ঠ। আর্য্য জাতি এক্ষণে দেবতার উচ্চ আসন হইতে নামিয়া পশু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্চ সোপান হইতে আমাদের অবনতি হইয়াছে।

আজকালকার ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই, সে শক্তি নাই, এখন কেবল মানুষের আকারমাত্র অবশিষ্ট আছে; পরে নিকৃষ্ট পশু হইয়া যাইবে;—গরু, গাধা, ছাগল, কুকুর, শৃগাল হইয়া যাইবে। হা ভারত! এই আর্য্য জাতিতেই ক্রমাবনতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। অবস্থার দুটী ভাগ,—ক্রমোন্নতি আর ক্রমাবনতি। আর্য্যজাতি এই দুই ভাগেরই দৃষ্টান্ত স্থল। আর্য্য-জাতির এক সময়ে ক্রমোন্নতি ছিল। এই জাতি এক সময়ে ক্রমোন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল, এখন ইহার ক্রমাবনতির কাল। আমরা পুরা মানুষ নহি—আমাদের পূর্ণত্ব নাই। সকল যন্ত্র আমাদের এখন নাই; যাহাও আছে, তাহা মরিচা-ধরা বিকল হইয়া আছে। আমাদের বংশধরগণ আমাদের নিকট হইতেই সকল গুণ শিক্ষা করিবে, সকল শক্তি ও ক্ষমতা পাইবে ত? আমাদের যে যে অংশের অভাব, সে সে অংশ তাহারা পাইবে না। আমাদের যে যন্ত্র আধখানা মাত্র আছে, তাহা। সে যন্ত্রের আধখানার আধখানা পাইবে। তবেই দিন দিন আমাদের অব-নতিই হইতেছে। ঋষিরা যা ছিলেন, তাঁহাদের তুলনায় আমরা কিছুই নহি। আমরা মানুষের আকারে আছি মাত্র; বোধ হয় আমাদের পরে যাহারা জন্মিবে, তাহাদের মানুষের আকার

পর্য্যন্তও থাকিবে না। এখন ভাবিয়া দেখ, ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে কি না। ধর্ম্ম আলোচনার দ্বারা ক্রমাবনতির গতি অবরোধ কর, ইন্দ্রিয়গণের মোহে ভুলিও না। পৌর্ব্বিক, যৌগিক ও সংস্কারজ শুভাদৃষ্ট চাই। ইন্দ্রিয় নিরোধ কর। শম, দম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করিবেন।

ধর্ম্ম সাধন।

(২)

আত্মাতে সকল গুণের বীজ অন্তর্নিহিত আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মা সকল গুণবীজের কোষ-স্বরূপ। এই কোষস্থ বীজ সমুদয় বপন করিতে হইলে ক্ষেত্রের আবশ্যক। সুতরাং আমরা দেহরূপ ক্ষেত্র পাইয়াছি। এই ক্ষেত্রে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়, ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। বীজস্থ শক্তির স্ফূরণ ও বিকাশ এই দেহে ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেহ যন্ত্র-সমষ্টি মাত্র। ডাল ভাত খাইয়া এই দেহ গঠিত হইয়াছে। আত্মা, ডাল ভাত প্রভৃতি ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করাইয়া দেহের গঠন ও বর্দ্ধন করান। অর্থাৎ আত্মার এরূপ শক্তি আছে, যদ্দ্বারা ভুক্ত পদার্থ রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জাতে পরিণত হয়। এ ছাড়া, শরীরে কতকগুলি নাড়ী আছে। তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি হয় (Sensory); কতকগুলি দ্বারা শক্তি-সঞ্চালন ক্রিয়া হয় (Motor); আর কতকগুলি, দেহের পুষ্টিসাধন করে (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না)। যন্ত্রের অসম্পূর্ণতা থাকিলে শক্তির বিকাশ

হয় না। যদি যন্ত্রগুলি অসম্পূর্ণ থাকে বা বিকল হয়, তবে আমরা তাহাদের পূর্ণায়তন করিবার চেষ্টা করি; অসম্পূর্ণতা বা বিকলতা যাহাতে ঘুচে, তদ্বিষয়ে আমরা যত্ন করি। আত্মাতে শক্তির প্রথম স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সেই স্ফূরণ অতি কোমল, মৃদু ও সূক্ষ্ম। যখন সেই শক্তি স্থূল শরীরে বিকাশ হয়, তখন অপরে তাহা দেখিতে পায়। শক্তির বিকাশ দুই প্রকার:—প্রথম, আভ্যন্তরিক বিকাশ; দ্বিতীয়, বাহ্য বিকাশ। প্রথম অবস্থাতে সূক্ষ্ম দেহে, দ্বিতীয় অবস্থাতে স্থূল দেহে বিকাশ হয়। প্রথম অবস্থাটা কেবল নিজের অনুভাব্য; দ্বিতীয় অবস্থা প্রকাশ্যমান, অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত। আত্মা সদাই হা, হা করিতেছে,—কি যেন অভাব! এ হা হা,—এ অভাব, যেন সহজে মিটে না। আত্মা ব্যাকুল, আত্মা অতৃপ্ত। আত্মাকে দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে; দেখিবার শক্তি আছে, সেই শক্তির ক্রিয়া হইবে বলিয়া যন্ত্র আছে। সে যন্ত্র চক্ষু। আত্মা চক্ষু দ্বারা বহিঃস্থ বিষয় দৃষ্টি করিতেছে; বাহ্য বস্তুর রূপ দেখিতেছে। আত্মার দর্শন-শক্তি আত্মাতেই ফুটিল; আবার সেই শক্তি, চক্ষু-যন্ত্র দ্বারা বাহিরে বিকাশ হইল। দর্শন-যন্ত্র না থাকিলে বা সেই যন্ত্র বিকল হইলে, আত্মার দর্শন-শক্তি আত্মাতেই ফুটিয়া, আত্মাতেই মিলাইয়া যায়, বাহিরে বিকাশ পায় না।

আত্মা শুনিবে, তাই শুনিবার যন্ত্র কর্ণ। আত্মা কর্ণ দ্বারা বাহিরের শব্দ শুনিতেছে। আত্মার শ্রবণশক্তি আত্মাতে ফুটিল; আবার সেই শক্তি কর্ণ দ্বারা বাহিরে বিকাশ পাইল। শ্রবণ-যন্ত্র না থাকিলে বা বিকল হইলে, আত্মার শ্রবণশক্তি আত্মাতে ফুটিয়া আত্মাতেই লয় পাইত, বাহিরে বিকাশ পাইত না। সেইরূপ

আত্মার ঘ্রাণশক্তি আছে, ঘ্রাণ-যন্ত্র নাসিকা দ্বারা আত্মা বাহিরের দ্রব্যের গন্ধ আঘ্রাণ করে। অ ঘ্রাণ ঘ্রাণশক্তি আত্মাতে ফুটিয়া নাসা দ্বারা বাহিরে বিকাশ পায়। নাসা না থাকিলে বা উহা বিকল হইলে, আত্মার ঘ্রাণশক্তি আত্মাতে স্ফুরণ হইয়া আত্মাতেই বিলীন হইয়া যাইত, বাহিরে ফুটিত না।

জিহ্বা ও ত্বক সম্বন্ধেও এই কথা। অর্থাৎ আত্মার রসাস্বাদনের ইচ্ছা ফুটিলে জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন হয়, স্পর্শনের ইচ্ছা হইলে ত্বক দ্বারা আত্মা স্পর্শানুভব করে। যদি জিহ্বা ও ত্বক না থাকিত বা বিকল হইত, তাহা হইলে রসাস্বাদন শক্তি ও স্পর্শন শক্তি অন্তরে ফুটিয়া অন্তরে মিলাইয়া যাইত, বাহিরে সে শক্তির বিকাশ হইত না।

নানা কারণে অনেক যন্ত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অনেকগুলি বিকল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেক শক্তির আদৌ বাহিরে বিকাশ হয় না। সকল লোকের সকল যন্ত্র নাই, কাহারও বা কোন যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমাদের মধ্যে জ্ঞানের এত প্রভেদ, সবার জ্ঞান সমান নহে, সকলের সকল শক্তির বিকাশ হয় না।

ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত কি কি আবশ্যক? ধর্ম্মসাধনের জন্য এই পাঁচটী জিনিস চাই :—

(১) ক্ষেত্রের সংস্কার, (২) আহার বিচার, (৩) সদাচার, (৪) ইন্দ্রিয়নিয়োগ শিক্ষা, (৫) সংযম।

এখন এক একটীর পৃথক বিচার করা যাউক।

(১) ক্ষেত্রসংস্কার—যেমন ক্ষেত্র অপরিষ্কার থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, ফসল হয় না, ক্ষেতজাত আগাছা পরগাছা

তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক, জল-সেচন প্রয়োজন, সেইরূপ দেহের সংস্কার করা আবশ্যক। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, ও বিবাহ এই তিনটী প্রধান সংস্কার। আর কান সংস্কার নামমাত্র আছে। কলিতে ইংরাজী শিক্ষার দোষে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, সকলই বিশৃঙ্খল।

(১) উপনয়নটা কি? উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জীবন লাভ করিবার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় জীবন কৈ হয়? যাহার উপনয়ন হয়, তাহার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিবে ও সে ব্যক্তি উন্নতিমার্গে গমন করিবে। এখন সে উন্নতি কৈ হয়? উপনয়নে স্বতন্ত্র, অভিনব, উন্নত জীব সৃষ্ট হইবার কথা। তা কৈ হয়? হইবার মধ্যে হয়—যজ্ঞসূত্র গলায়। তাহাও কেহ কেহ বড় হইয়া পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ নিজের দোষে আপন গৌরব ও পদমর্য্যাদা হারাইয়াছেন।

(২) আহার বিচার—এখন আহারের বড় একটা বিচার করা হয় না। পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিলে শরীর পুষ্ট হয়; অপুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিলে শরীর ক্ষীণ হয়। শরীরের সহিত ধর্ম্মালোচনার নিকট সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে ধর্ম্মকর্ম্ম করা যায় না। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে খাদ্যাখাদ্যের বিচার হইয়া থাকে। যাহাদের প্রকৃতি সত্ত্বগুণ-প্রধান, তাহাদের সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা; যাহাদের প্রকৃতি রজোগুণ-প্রধান, তাহাদের পক্ষে রাজসিক আহারই প্রশস্ত; আর যাহারা তমোগুণে পরিপূর্ণ, তাহারা কেবল তমোগুণবর্দ্ধক আহারে তুষ্ট। যাহারা যে প্রকার দ্রব্য আহার করে, তাহাদের প্রকৃতিও সেইরূপ আহারের

দ্রব্যের গুণ প্রাপ্ত হয়। কাহারও প্রবৃত্তি মৎস্য, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, সালগাম, গাজোরে ; কাহারও প্রবৃত্তি রুটি, লুচি, মিঠাই, মণ্ডা, রসগোল্লাতে ; কেহ বা ছানা চিনি, ফলমূল, দুগ্ধ আহার করিতে ভাল বাসে। আবার গব্যঘৃত আতপান্নে কাহারও পরি-তোষের সীমা নাই। কেহ টাট্‌কা সামগ্রী খাইতে ভাল বাসেন ; কাহারও বাসী ও পচাতে তৃপ্তি। মোট কথা, অখাদ্যটা না খাওয়াই ভাল ; আহার বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া উচিত। অখাদ্যে কেবল তমোগুণ বর্দ্ধিত করে ; সুতরাং অখাদ্য-ভোজন ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ধরুন পেঁয়াজ,—ইহাতে গন্ধক আছে, তাই এটা এত দুর্গন্ধ। মলমূত্রে, নিশ্বাসবায়ুতে, ঘর্ম্মে এ দুর্গন্ধ থাকে। ইহা খাইলে তমোগুণ বর্দ্ধিত হয়, সত্ত্বগুণের শক্তিকে প্রতিহত করে। তাই বলি, যে খাদ্যে সত্ত্বগুণ বাড়ায়, তাহাই খাওয়া বিধি ; আর যাহাতে তমোগুণ বাড়ায় তাহা পরিবর্জ্জনীয়।

(৩) আচার সম্বন্ধে দেখিতেছি সব ব্যভিচার। ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ; তাহাদের দেখাদেখি অপর জাতিরাও আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিশুদ্ধ ও পবিত্র আচারে থাকিলে ধর্ম্মসাধনের সহায়তা হয়। অশুচি ও অপবিত্র হইলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেই জন্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে,—কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইবে ;—জলশৌচের নিয়ম কি,—মৃত্তিকা ব্যবহারের ব্যবস্থা কিরূপ। প্রস্রাবের পর অনেকেই জল লয় না। অন্য কিছু হউক আর না হউক, অশুচি হইতে হয় ত—মূত্রলাটা শরীরে লাগে ত ; ইহাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে। ধর্ম্মের খাতিরে না হউক, স্বাস্থ্যের খাতিরেও ত পরিষ্কার থাকা উচিত।

(৪) ইন্দ্রিয় নিয়োগের কথা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা উঠিতে, বসিতে, চলিতে, বলিতে জানি না। ইন্দ্রিয় আছে সত্য, ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্রিয়া হইতেছে সত্য; কিন্তু কোন্ যন্ত্র কিরূপে, কি ভাবে রাখিতে হয় বা ধরিতে হয়, তাহা কি আমরা জানি, না বুঝি? যন্ত্রগুলি কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা সকলেই দর্শন-যন্ত্র ব্যবহার করি—দেখি সত্য; কিন্তু ঠিক দেখিতে জানে কয় জন? কেমন ভাবে চক্ষু রাখিলে দৃষ্টি করা হয়, বল দেখি ভাই! কাহারও বা সুদৃষ্টি, কাহারও বা কুদৃষ্টি। মনে কর, একটী পরমসুন্দরী রমণী আপন শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সেই রমণীকে অনেক ভাবে ত দেখা যাইতে পারে। তুমি কুদৃষ্টিতে তাঁহার পানে দৃষ্টি করিলে,—বক্রদৃষ্টিতে দেখিলে, যেন রমণী তোমার ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্যা, এই ভাবে চক্ষু স্থাপন করিয়া অপাঙ্গবীক্ষণ করিলে। তোমার মনে পাপের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু যদি তুমি ইন্দ্রিয়-নিয়োগ শিক্ষা করিতে, যদি দর্শনযন্ত্র স্থাপন করিতে জানিতে, তাহা হইলে সেই রমণী-মূর্ত্তিকে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য এই অপবিত্র ভাবে দেখিতে না,—তোমার মনে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব উদয় হইত। তুমি পবিত্র চক্ষে দেখিতে—সেই রমণীর জগদ্ধাত্রী-ভাব,—জগন্মাতা-ভাব;—দেখিতে, সেই আদ্যাশক্তি বিশ্বপালন করিতেছেন। আহা, মরি মরি!!

(৫) সংযম—বাসনাকে যত সংযত করা যায়, ততই সাধকের পক্ষে মঙ্গল। ইন্দ্রিয়গণ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলে সুখের প্রবাহে আমাদের বিবেক, বৈরাগ্য সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আবশ্যক। সংসারে থাকিলে ইন্দ্রিয়

সংযমের ব্যাঘাত ঘটে, একথা কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাই। কিন্তু কথাটা তত সারবান নহে। এ সংসার শিক্ষার স্থল। সংসারে থাকিয়া সংযম-শিক্ষা সুচারুরূপে হইতে পারে। আয়ের অনুরূপ ব্যয় করিতে হইবে, এ শিক্ষা সংসারে থাকিয়াই হয়। কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে হইবে, ইহা এই সংসারের শিক্ষা। দেখা যায়—যে ব্যক্তির যত্র আয় তত্র ব্যয়, তাহার কিছুই সঞ্চয় হয় না—সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র পরিবার বড় কষ্ট পায়। ধর্ম্মপথে গেলে সঞ্চয় করাটা শিক্ষা করিতে হয়—ধর্ম্মে, অর্থ-সঞ্চয় নহে—তেজ সঞ্চয়; তেজসঞ্চয় হইলে ক্ষয় হয় না। আমার এই আয়, আমাকে যে কোন প্রকারে হউক না, ঐ আয়ের ভিতরে চালাইতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে মনের একটা দৃঢ়তা জন্মে। সেটা সংযম শিক্ষার অনুকূল!

এইগুলি হইলে, ধর্ম্মসাধনের অধিকারী হইলে; তাহার পর ভগবানকে আরাধনা করিবে।

সাকার ও নিরাকার বাদ।

প্রথম প্রস্তাব।

(৩)

কেহ বলিতে পার, আমাদের প্রাণ এত ব্যাকুল হয় কেন? কাহার জন্য আমরা এত অস্থির হই? আমাদের আত্মা কাহাকে চায়? উত্তর—ভগবানকে। বলিতে পার, মনের অশান্তি যায় কিসে? এ অভাব কিসে দূর হয়? উত্তর—ভগবানকে পাইলে। মুখে হরি হরি বলিলে যদি ভগবানকে পাওয়া যাইত তাহা হইলে

ভাবনা কি ছিল? হরিকে পেতে হ'লে সাধনা করা চাই। সাধনার পূর্ব্বে জানা চাই হরি কি বস্তু, ভগবান কেমন? শুনিয়াছি ভগবান শান্তির নিকেতন—নিত্য, অব্যয়, আনন্দময়, জ্ঞানময়, অসীম, অনন্ত, অপার। তাঁহার মহিমা বিশ্বব্যাপী। তিনি দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত। তাঁহার দয়ার, প্রেমের, প্রীতির কণিকার জন্য আমরা লালায়িত। আমরা অতি ক্ষুদ্র; তিনি অসীম, অনন্ত। তাঁহাকে আমরা কেমন করিয়া জানিব? তিনি ইন্দ্রিয়ের, জ্ঞানের, বুদ্ধির অতীত। অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ক্ষুদ্র নর বলিল তিনি সাকার। দম্ভভরে কেহ বা বলিল তিনি নিরাকার। এক নিঃশ্বাসে আমরা এইরূপে এ গুরুতর বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া ফেলি। অহো! কি বিড়ম্বনা!! তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না। তিনি সাকার অথবা তিনি নিরাকার; তিনি সগুণ অথবা তিনি নির্গুণ—এ মীমাংসা কে করিবে? কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? কে কবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছে যে সাক্ষ্য দিবে? কোন্ ব্যক্তির সাক্ষ্য, কাহার বা প্রমাণ-প্রয়োগ আমরা গ্রাহ্য করিব? আমরা তাঁহাকে দেখি নাই, সুতরাং আমাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য আমাদের আত্মা দূষিত ও কলুষিত। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভৃত্য, বন্ধু বান্ধব ইহারাই শিশু সন্তানের শিক্ষাদাতা। ইহাদের শিক্ষানুসারে, বালক বালিকা শিক্ষিত হয়। শিক্ষাদাতার স্বভাব ও প্রকৃতি, বালক বালিকা পাইয়া থাকে। অতএব আমাদের আত্মার কথায় বিশ্বাস কি?—সে আত্মা ত স্বাধীন নহে; সে জন্য আত্ম-প্রত্যয় হয় না। তাহা ছাড়া আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মা পরিচালিত। সে জন্যও আত্ম-প্রত্যয় হয় না।

আত্ম-প্রত্যয় হইল না; অন্য উপায় কি? শাস্ত্র সাক্ষ্য, শাস্ত্র

প্রমাণ। শ্রুতি, ও শ্রুতিকারদের কথায় আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে। সে গূঢ় তত্ত্ব বুঝি নাই, তোতা পাখীর মত সে কথা শুনিয়াছি মাত্র। যাহা শুনিয়াছি তাহাই আপনাদের বলিতেছি। যাঁহারা বলেন বেদে সাকার ঈশ্বরের কোন কথা নাই, কেবল নিরাকার ভগবানের কথাই আছে, তাঁহারা ভ্রান্ত। ঋক্, সাম, যজুর, অথর্ব্ব এই চারি বেদেই সাকার, ঈশ্বরের কথা আছে। ঋক্ বেদের দেবীসূক্ত ও শিবসূক্ত তাহার প্রমাণ। অতি প্রাচীন ঋক্ বেদীয় সংহিতায় যে সকল সূত্র আছে তাহাতে ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্মবাচক শব্দ নাই। বেদের অনেক পরে লিখিত উপনিষদে ঐ সকল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গাস্তব, কালীস্তব, শিবের স্তব পাঠ করিলে বুঝা যায় ঈশ্বর সাকার। দুর্গার বর্ণ, গলিত স্বর্ণের ন্যায়, এরূপ বর্ণিত আছে। বেদের কোন কোন স্থানে, "ঈশ্বর সাকার," বলা হইয়াছে; অপরাপর স্থানে, "ঈশ্বর নিরাকার", বলা হইয়াছে। কিসে এ কথার সামঞ্জস্য হয়?

ভগবদ্গীতায় আত্মার সম্বন্ধে এই সকল শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে—"নিরাকার, নির্ব্বিকার, অব্যয়, নিত্য, জ্ঞানাতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর;" কঠোপনিষদে ও দেখিতে পাওয়া যায় নচিকেতাকে যমরাজ আত্মা সম্বন্ধে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে ঐ সকল কথা কোথাও নাই। সামঞ্জস্য এইরূপে হইতে পারে। আমাদের আত্মা "নিরাকার, নির্ব্বিকার, অব্যয়"—এই হ'ল জীবাত্মা। জীবাত্মা সম্বন্ধে যে কথা বলা যায়, পরমাত্মা সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ভগবানের আত্মা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—ইহা "নিরাকার, নির্ব্বিকার, অব্যয়, নিত্য," আবার ভগবান কালী, দুর্গা, শিবরূপেও অধিষ্ঠান

করেন। তিনি সগুণও বটেন আবার নির্গুণও বটেন। যখন তাঁহাকে সাকার ভাবি (রূপগুণ বিশিষ্ট) তখন তিনি সগুণ। যখন তাঁহাকে নিরাকার মনে করি, তখনও তিনি সগুণ। ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম (আত্মা); পরমাত্মা নির্গুণ ব্রহ্ম (আত্মা ভাগ ঈশ্বরের তুরীয় অবস্থা)।

ভগবানের বিষয় সম্যক্ জানিবার উপায় নাই, উহা অসম্ভব। তাহার কারণ ভগবান অনন্ত অসীম। তাঁহার প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। এক এক ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি পৃথিবী। পৃথিবীর একটী ক্ষুদ্র কোণে তুমি, জীব। কীটানুকীট হইয়া সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকে তুমি কেমন করিয়া জানিবে বল। ভগবান অনন্ত, অসীম, বিশ্বব্যাপী হইয়া দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বাস করেন। কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। বস্তুত অসঙ্গত নহে। ইহার অর্থ এই যে ভগবানকে ধ্যান করিতে হইলে সহস্রারে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হয়। আমাদের মস্তকে খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক। উহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে। ঐ ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্র দল-পদ্ম আছে। সে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ভগবানের আসন।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আপাততঃ বিরোধী ও অসংলগ্ন কথা অনেক দেখা যায়। আমরা ঠিক ভাবটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না—ভ্রমে পড়ি।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

জগতের প্রধান ধর্ম্ম তিনটী—হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও খ্রিষ্টীয়ান ধর্ম্ম। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, খ্রিষ্টীয়ানের

বাইবেল। ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে লোকের মনে কিরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল; উপাসনা প্রণালীই বা কিরূপ ছিল—এ সকল কথার এক-বার আলোচনা করা আবশ্যক। সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে, অতি প্রাচীনকালে এক মাত্র সাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত ছিল। এই সার্ব্বভৌম সাকারবাদ ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইজিপ্ত, এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা দেশে এই সাকার উপাসনা ছিল। এখনও কোল, ভীল, সাঁওতালদের মধ্যে কালীপূজা, শিবপূজা প্রচলিত আছে। বাইবেলের ঈশ্বর সাকার। যিশু, ভগবানের প্রার্থনা করিতেছেন—"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা" ইত্যাদি। ঈশ্বরকে স্বর্গরাজ্যে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসান হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরকে সাকার বলা হইল, না নিরাকার বলা হইল? দেখিলেন, খ্রিষ্টীয়ান ধর্ম্মে সাকারবাদ আছে। মুসলমান ধর্ম্মে ঈশ্বরবাচক শব্দ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আর ঈশ্বর যে সাকার তাহাও ইস্‌লাম ধর্ম্মে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই স্বর্গরাজ্য, সেই স্বর্ণ-সিংহাসন এধর্ম্মেও আছে। আল্লা কথাটি দুটী শব্দে গঠিত—আল্+হা—আল্লা শব্দে পিতা মাতা বুঝায়।

হিন্দু ধর্ম্মে সাকারবাদ যথাতথা পাইবে। শাস্ত্রে বলে, সাধকেও বলে—ঈশ্বর সাকার। যদি ঈশ্বর নিরাকার হইতেন, তাহা হইলে ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি সাধকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। ঈশ্বর নিরাকার হইলে শাস্ত্রকারগণ তাঁহার রূপ কল্পনা করিতেন না; মুনি ঋষিরা তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন না। কাশীর ত্রৈলঙ্গ-স্বামী দেহ রক্ষার পূর্ব্বে এক বৃহৎকায় শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তি এত বড় যে সিঁড়ি দিয়া তাঁহার মাথায় জল

চালিতে হয়। এখন ভাস্করানন্দস্বামী কাশীধামে বর্ত্তমান। তিনি সাকারবাদী, নিরাকারবাদী নহেন। যদি ঈশ্বর নিরাকার হইতেন, তাহা হইলে কি এই সকল সাধু-ব্যক্তিরা কখন সাকার উপাসনা করিতেন? যখন শাস্ত্র, সংস্কারক, সাধক, সন্ন্যাসী, মুনিঋষি, ছোট বড় সকলেই একবাক্যে বলেন—ঈশ্বর সাকার তখন তাঁহাকে সাকার বলিব বৈ কি? নিরাকার কেন বলিব? ভাষাতত্ত্বের অন্যতম অঙ্গ শব্দতত্ত্ব। এই শব্দতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক—ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার।" "শব্দ-ব্রহ্ম" একথা অনেকেই জানেন। বর্ণমালায় ৫টী বর্গ আছে, যথা ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ। ইহা ছাড়া আর দুইটী বর্গ ধরা যাইতে পারে। যরলব একটী, আর শষসহ অন্য বর্গ; এখন ৭টী বর্গ হইল। বর্গ শব্দে রং বুঝায় ত? রং বলিলে রূপ আসিল ত? রূপ বলিলে আকার বুঝাইল না কি? তবেই দেখা গেল, বর্ণে শব্দ আছে, রূপ আছে, আকার আছে। "শব্দ ব্রহ্ম," শব্দই ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মে শব্দ বা নাদ আছে, ব্রহ্মের রূপ আছে, আকার আছে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই পাঁচ বর্ণ পাঁচটী বিভিন্ন শব্দের চিহ্ন-মাত্র। ক, খ, গ, ঘ, ঙ বলিতে গেলেই ৫টী শব্দ উচ্চারিত হয়। ক'র রূপ আছে, খ'র রূপ আছে, গ'র আছে। এইরূপ সকল বর্ণেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। এক একটী অক্ষর এক একটী স্বতন্ত্র মূর্ত্তি। কেহ কাল, কেহ সাদা, কেহ হরিদ্রাবর্ণ, কেহ সবুজ, কেহ লাল, কেহ নীল ইত্যাদি। অতএব শব্দ ব্রহ্মের নানাবর্ণ, নানা রূপ, নানা আকার, নানা মূর্ত্তি। কোন মূর্ত্তি লাল, কোন মূর্ত্তি কাল, কোন মূর্ত্তি হরিদ্রাবর্ণ, কোন মূর্ত্তি সাদা, কোন মূর্ত্তি নীল, কোন মূর্ত্তি সবুজ। ব্রহ্মা লাল, কালী কাল, দুর্গা হলদে, মহেশ্বর

সাদা, বিষ্ণু নীল, রাম সবুজ ইত্যাদি। ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন মূর্ত্তিতে সেই এক "শব্দ-ব্রহ্মের" কল্পনা।

ভাষাতত্ত্বের অন্তর্গত শব্দতত্ত্বদ্বারা প্রমাণিত হইল যে ঈশ্বর নিরাকার নহে, ঈশ্বর সাকার।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ঈশ্বর, যদি সাকার হইলেন তবে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইনা কেন? সাকার ঈশ্বর আমাদের দৃষ্টির গোচর হন কি না একথা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্য সম্বন্ধে একবার বিচার করা আবশ্যক। বিষয়টী কঠিন, সহজে বুঝা যায় না; এজন্য একটু মনোযোগের আবশ্যক।

ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্য বিচার করিতেছি। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক, নাসিকা এই পাঁচ ইন্দ্রিয়। চক্ষুদ্বারা রূপ বা বর্ণ দেখি; কর্ণদ্বারা শব্দ শুনি; নাসিকাদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করি; জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করি; ত্বকদ্বারা স্পর্শ অনুভব করি। এই হইল সাধারণ নিয়ম। সাধারণ নিয়ম সকলেই জানে। কিন্তু ইহার একটু বিশেষত্ব আছে। তাহা এই—চক্ষুদ্বারা কেবল যে রূপ দেখা যায় এমন নহে; চক্ষুদ্বারা আমরা শ্রবণ, স্পর্শানুভব, আস্বাদন, আঘ্রাণ করিয়া থাকি। আবার কর্ণদ্বারা কেবল যে শব্দ শুনি এমত নহে; দৃষ্টি, স্পর্শানুভব, আস্বাদন ও আঘ্রাণ করিয়া থাকি। ত্বকদ্বারা জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষুরও কার্য্য হইয়া থাকে। ফলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আপন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে মাত্রার অল্পাধিক্য আছে। ইহার কারণ কি? কিরূপে ঐ ব্যাপার ঘটে? বিজ্ঞানে দর্শন ক্রিয়ার কিরূপ ব্যাখ্যা আছে আপনারা জানেন। দৃশ্যবস্তু হইতে আলোক রশ্মি

নিঃসৃত হয়। তাহাদ্বারা চতুষ্পার্শ্বের ইথর (তরল বায়ু) কম্পিত হইয়া উঠে সেই কম্পন (Etherial vibration) তরঙ্গাকারে আসিয়া আমাদের সর্ব্বশরীরে লাগে। কতককগুলি রশ্মি বর্ণে প্রবেশ করে, কতকগুলি নাসিকায় প্রবেশ করে, কতকগুলি জিহ্বাগ্রে, কতক-গুলি ত্বকে পড়ে, কতকগুলি চক্ষে পড়ে। চক্ষু, দৃষ্টির প্রধান যন্ত্র। যখন রশ্মি চক্ষে পড়ে তখন স্পষ্ট দর্শন কার্য্য হয়। আর যখন অপরাপর ইন্দ্রিয়ে পড়ে তখন সে সে স্থলে অস্পষ্টভাবে দর্শন ক্রিয়া হয়। চক্ষেই কেবল রূপ দেখা গেল, অন্যত্র দর্শনশক্তি অতি সূক্ষ্মভাবে অনুভূত হইল মাত্র। সেইরূপে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইল তাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান জন্মে তাহা অসার, অনিত্য, নাস্তিক, প্রবাহ্য জ্ঞান সার গভীর, নিত্য, স্বরূপ জ্ঞান নহে (Phenomenal, not noumenal knowledge)। ভিতরের সার বস্তুটা কি (Substance) তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, ভাসা ভাসা আমরা জানি কেবল দুই একটা গুণ। কথাটা আর একটু বিশদ করিতেছি। আমরা এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করি। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ এই জ্ঞান হয়। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ এগুলির নাম তন্মাত্রা। আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। শক্তি অনেক আছে। আমাদের ইন্দ্রিয় পাঁচটী বই নয়। সুতরাং এই পাঁচ ইন্দ্রিয়-সম্ভূত জ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান আমাদের হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে বাকি অনেক শক্তির ও গুণের উপলব্ধি করিবার আমাদের ক্ষমতা নাই।

উপরে যে সকল কথা বলা গেল তাহাতে এই বুঝিলাম যে ঈশ্বর সাকার হইলেও আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না তাহার

কারণ ঈশ্বরের রূপের ছটার পূর্ণ বিকাশ উপলব্ধি করিবার শক্তি আমাদের চর্ম্ম চক্ষে নাই। জীবের রূপ আর ভগবানের রূপ ভিন্ন উপাদানে গঠিত। মানব চক্ষুর গঠন, জীবের বা জড়ের রূপ দেখিবার উপযোগী; অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের রূপ দেখিবার উপযোগী নহে। সে শক্তি আমাদের চর্ম্ম চক্ষে নাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না।

এখানে আর একটু বিস্তার করিব। বিষয় ক্রমে জটিল হইয়া পড়িতেছে, উপায় নাই।

রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ এই তন্মাত্রা গুলি স্থিরত্ব, চাঞ্চল্য লঘুত্ব, গুরুত্ব, স্থুলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, তীক্ষ্নত্ব, তীব্রত্ব, জাড্য ভাবের তারতম্য অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখন মনে কর ইহারা তিনটী গুণবিশিষ্ট—সত্ব, রজ, তম। প্রথমে ধর, রূপ—রাঙ্গা সবুজ, হলদে। (১) কোনটা কোমল, আনন্দজনক—সত্ব। (২) কোনটা তীব্র, তীক্ষ্ণ, চঞ্চল—রজ। (৩) কোনটা অবসাদজনক, নিস্তেজক ধ্যাবড়ান—বোদারসের ন্যায়—তম। সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, ঘ্রাণ। কোনটা মিষ্টস্বর, কোনটা তীব্র কর্কশ, কোনটা অবসাদজনক।

দেখা গেল, শক্তি থাকিলেই যথেষ্ট হইল না। সেই শক্তি তম গুণদ্বারা পরিচালিত হইয়া বিকৃত হইতে পারে। তর্কের স্থলে স্বীকার করিলাম আমাদের শক্তি আছে। কিন্তু গুণভেদে শক্তি বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সে জন্যও আমরা সাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না।

এতক্ষণ বহির্জগতের কথা বলিলাম, এখন অন্তর্জগতের কথা বলিতেছি। বহির্জগতে যেমন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ শক্তি

নিচয় আছে, সেইরূপ অন্তর্জগতেও অনেক শক্তি আছে ;—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া, স্নেহ, আনন্দ। তথা কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য, শোক, দুঃখ, অভিমান, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ। বাহ্য জগতে যে তিন গুণ আছে, অন্তর্জগতেও সেই তিন গুণ আছে। সত্ব, রজ, তম। ইহাদের ঘাত প্রতিঘাতে, ঘর্ষ সংঘর্ষে কম্পন (Vibration) উপস্থিত হয়, তাহার তরঙ্গ খেলিতে থাকে। সেই তরঙ্গাবলী বিস্ফূরিত ও বিস্তৃত হইয়া অন্তর্জগৎ ব্যাপিয়া ফেলে। পরে বহির্জগতে উহা ফুটিয়া বাহির হয়।

ঈশ্বরে গুণ-সাম্য আছে কিন্তু আমাদের অন্তরে গুণ বৈষম্য। আর এক কথা ;—ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, চেষ্টাপ্রবাহ ও কার্য্য এই চারিটী কথা মনে করিতে হইবে। মনে প্রথমে ইচ্ছার অঙ্কুর উদয় হইল, পরে স্ফূর্ত্তি পাইয়া বর্দ্ধিত হইল, চেষ্টা আরম্ভ হইল। স্নায়ুদিয়া তাড়িৎ সঞ্চালনের ন্যায় ঐ শক্তির প্রবাহ ছুটিল, পরে কার্য্য হইল ; বুদ্ধি, মন, অভিমান, বহিরিন্দ্রিয় এই গুলির সহিত জাগ্রত, তন্দ্রা, সুপ্তি, সুষুপ্তি এই ৪টী অবস্থার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। চক্ষু দিয়া রূপ দেখিতেছি জাগ্রত অবস্থায়, তন্দ্রা অবস্থাতে রূপ দেখি ; সুপ্তি অবস্থাতে রূপ দেখি না, রূপের ছায়া মাত্র দেখি ; সুষুপ্তিতে (যখন চৈতন্য ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই) রূপের ছায়া ও দেখি না। চক্ষু দিব্যত্ব লাভ করিলে এই চর্ম্ম চক্ষেই ঈশ্বরকে দেখা যায় অর্থাৎ সাকার ঈশ্বর দর্শন হয়। আমর বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। "ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার" এ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা এক নিঃশ্বাসে হয় না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তবে ভরসা এই যে দুই একটা স্থূল কথা যাহা বলিলাম তাহা অবলম্বন করিয়া আপনারা এই বিষয়ের চিন্তা করিতে পারি-

বেন এবং প্রকৃষ্ট আলোচনা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন।

উপাসনা।

(৫)

একটু আনন্দ উপভোগ করিবার বাসনায় ভগবানের কথা তোলা হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্ব আলোচনার ফল—মুক্তি ও শান্তি-লাভ। ভগবান শান্তির আলয়, দয়ার সাগর, ভক্তি ও প্রীতির আধার। সংক্ষেপতঃ ভগবান সর্ব্বগুণ ও সর্ব্বশক্তির আকর। আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব; আমাদের আত্মাতে কতকগুলি শক্তির বীজ নিহিত আছে মাত্র। দয়া, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি, শম, দম, উপরতি, শান্তি—বীজাকারে আছে। মুক্তির অর্থ এই যে আমাদের ক্ষুদ্র দয়াটুকু ভগবানের দয়াসাগরে মিশাইয়া দেওয়া; আমাদের ক্ষুদ্র প্রেম ও ভক্তি তাঁহার অনন্ত প্রেম ও ভক্তিতে মিশাইয়া দেওয়া; আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা সেই সর্ব্ব গুণাকর ঈশ্বরে নিমজ্জিত করা। জীব সেই অনন্ত সাগরে বুদ্বুদ্ মাত্র। মনে কর কোন একটী জলপূর্ণ পাত্রে এক খণ্ড বরফ ভাসিতেছে। ভাসমান বরফ-খণ্ড জল হইতে ভিন্ন আকারের। সেই বরফ-খণ্ড ভাসিতেছে আর ক্রমে গলিতেছে, গলিতে গলিতে জল হইতেছে। বরফ-গলিত জল, পাত্রস্থ জলের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। বরফ-গলা জল, পাত্রস্থজল একই ত? জলে ও বরফে যেরূপ সম্বন্ধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় সেইরূপ সম্বন্ধ। বরফ গলিল, জল হইল, পাত্রস্থজলে মিশিয়া গেল। জীবাত্মা

পরমাত্মাতে ভাসিতেছে; পরে গলিয়া উঁহাতে মিলিয়া যাইবে, মিশিয়া যাইবে। কি উপায়ে এই মিলন, এই মিশ্রণ ও সংযোগ ঘটিতে পারে? উপাসনাদ্বারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ ঘটিয়া থাকে। উপাসনা শব্দটী উপ + আসন্ যোগে সাধিত হইয়াছে। উপ অর্থে নিকট, আর আসন্ (আস্ ধাতু) অর্থে থাকা বা আসা। উপাসনা বলিলে ভগবানের নিকটে আসা বুঝায়। যে উপায় দ্বারা ভগবানের নিকটে যাওয়া যায় বা আসা যায় তাহাকে উপাসনা কহে। কেবল নিকটে আসিলেই ত চলিবে না; গলিয়া যাইতে হইবে, তাঁহাতে মিলিয়া যাইতে হইবে; তাঁহাতে মিশিয়া যাইতে হইবে। জীবের মুক্তি পাওয়া চাই। উপাসনার অঙ্গ অথবা চরম ফল মুক্তিলাভ। এখন, মুক্তিলাভের উপায় কি? মুক্তি পাইবার তিনটী পথ আছে—ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম। ভক্তি বলিলে ভাল-বাসা আসিয়া পড়ে; যেমন ছেলে পিতা মাতাকে ভক্তি করে। জ্ঞান অর্থে, সত্যজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সদসৎবস্তুর ভেদাভেদ জ্ঞান বুঝায়। কেবল গোটা কতক পুঁথির কথা শিখিলে জ্ঞান জন্মে না। তর্ক, বিচার ও যুক্তি দ্বারা সত্যের উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান। কর্ম্ম কেমন? মা সন্তানকে পালন করেন; সন্তানের শুভকামনায় বার ব্রত করেন। এ সবই কর্ম্ম। যাগ, যজ্ঞ, হোম এ সকল কর্ম্ম। কেবল জ্ঞানমার্গে, বা কেবল কর্ম্মমার্গে, বা কেবল ভক্তিমার্গে চলা বড়ই কঠিন। জ্ঞানকর্ম্ম-সমন্বিত ভক্তি-প্রধান যে মার্গ তাহাই আমাদের পক্ষে এখন সম্যক উপযোগী। ভক্তির অনুশীলন করিবার পূর্ব্বে আমাদের বুঝিতে হইবে, ভক্তি করিব কাহাকে, ভক্তি করিব কেন? ইহার উত্তর—ভগবানকে ভক্তি করিতে হইবে। কিন্তু ভগবানের সহিত আমার সম্বন্ধ কি?

ভাবিতে হইবে তাঁহার দ্বারা আমার কি উপকার সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে। এই দুইটী কথা জ্ঞানমার্গ হইতে নিতে হইবে। বিচার, যুক্তি ও তর্কদ্বারা এই সত্যের, এই জ্ঞানের উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার পর, ভক্তি কার্য্যদ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। সেই কর্ম্মানুষ্ঠান, কর্ম্মকাণ্ড হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। এখন দেখা যাক সম্বন্ধ কয় প্রকার? পিতা ও পুত্র, মাতা ও সন্তান, পুত্র ও পিতা, পুত্র ও মাতা, স্বামী ও স্ত্রী, সখা ও সখা, প্রভু ও দাস। ভগবান পিতা, তুমি তাঁহার পুত্র; ভগবান মাতা, তুমি তাঁহার সন্তান; ভগবান স্বামী তুমি স্ত্রী; ভগবান তোমার সখা; ভগবান তোমার প্রভু; তুমি দাস; ভগবান পুত্র তুমি পিতা; এই ছয়রূপ সম্বন্ধ। এখন দেখিতে হইবে, তুমি জগতে কাহাকে বেশী ভালবাস। তুমি যাহাকে অধিক ভালবাস তাহার সহিত তোমার যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত তোমার সেই সম্বন্ধ হওয়া উচিত। অন্য সম্বন্ধ পাতাইলে উভয়ে মিলিবে না। এইরূপে ভগবানের সহিত তোমার সম্বন্ধ নির্ণয় হইল। তাহার পর দেখিতে হইবে তুমি ভগবানের নিকট কি উপকার পাও। ভগবান সকলের লালনপালন করিতেছেন, পদে পদে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন, ভগবান তোমার মাতা; মার দয়া, মার যত্ন, মার স্নেহ, একবার ভেবে দেখ। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেরই মধ্যে সেই মাতৃশক্তি বিরাজ করিতেছে। সেই জগন্মাতা, সকল মা'র ভিতরে আছেন বলিয়াই ত সকল মা'র মাতৃভাব। মা দশমাস দশদিন তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন; এ অবস্থায় কত যত্নে, কত সাবধানে, মাকে থাকিতে হয়। কত কৌশলে পক্ষী বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মার গর্ভে তোমার বাসাও

সেইরূপ—একটী খোঁটায় সেই বাসা ঝুলিতেছে, বাসার চারিদিকে জলরাশি। এ সকল কেন? পাছে তোমায় ধাক্কা লাগে, পাছে তুমি আঘাত পাও। মা দশমাস দশদিন কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, শেষে ভয়ানক প্রসববেদনা ভোগ করিয়াছেন। তোমার রোগ হইয়াছে, তোমার মা আহারনিদ্রারহিত, ভাবনায় ভাবিত। বাপে এ কষ্ট সহ্য করিতে পারে কি? পক্ষীর বিবেক নাই। বল দেখি, কে পক্ষীকে নীড় নির্ম্মাণ করিতে শিখাইল? ঝড় বৃষ্টিতে আপন ডানা বিস্তার করিয়া ডিম ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে, পাছে ডিমের মধ্যস্থিত শাবক মরিয়া যায়। কে তাহাকে বলিল যে ডিমের মধ্যে তাহার বাচ্ছা আছে? বল দেখি ভাই, এ মায়ার শিক্ষা কে তাহাকে দিল। আপনি অভুক্ত থাকিয়া বাচ্ছাকে আহার যোগাইতেছে। বাচ্ছা বড় হইলে, উড়িতে শিখিলে, অমনি মার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ফুরাইল। সেই জগন্মাতা পক্ষীরূপিনী হইয়া শাবকপালন করিতেছেন। আমাদের জন্য মা এত করেন। শ্রীহরি আমার সখা, পরম বন্ধু। অন্য বন্ধু সর্ব্বক্ষণ কিছু আমার নিকটে থাকেন না। কিন্তু ভগবান আমার অন্তরে অষ্টপ্রহর রহিয়াছেন—সব দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, জানিতেছেন। সৎপরামর্শ দিতেছেন, অসৎ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন। তুমি পুরুষ, কিন্তু মনে করিবে যে তুমি স্ত্রীলোক, আর ভগবানকে মনে করিবে তিনি তোমার স্বামী। এটী বড়ই কঠিন কাজ। যদি স্ত্রীস্বভাব গ্রহণ করিতে না পার, যদি সে উপলব্ধি না হয়, তবে কখনও হরিকে স্বামীরূপে ভজন করিও না, অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

সম্বন্ধ নির্ণয় হইল, প্রাপ্ত উপকারও স্থির হইল। পরে ভক্তির

উচ্ছ্বাস হইবে। ভক্তির উচ্ছ্বাস হইলেই ভক্তির পাত্র ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা হইবে। আকার গড়িয়া, সেই মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া, পলকশূন্য চক্ষে তাহা দেখিতে ইচ্ছা হইবে। কুমার, চিত্রকর, ও সাজকরদ্বারা প্রতিমা গড়াইতে হইবে, রঞ্জিত ও চিত্রিত করিতে হইবে ও সাজাইতে হইবে। তাহা না হইলে সকলই "ফক্কিকার তন্ত্র" বিড়ম্বনা মাত্র। Art studio হইতে যে সকল ছবি বাহির হইতেছে, তাহাতে দেবমূর্ত্তি লক্ষিত হয় না। দেবতার প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার প্রয়োজন আছে। অষ্টপ্রহর দেবমূর্ত্তি দেখিবার বাসনা; সে বাসনা সফল করিব বলিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া থাকি। যাহাকে ভাল-বাসি তাহাকে সতত দেখিতে ইচ্ছা হয়, চক্ষের অন্তরাল করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি যে খাবার খেতে ভালবাসি, আমার প্রিয়-জনকে তাহা খাওয়াইতে ইচ্ছা হয়। আমি যে পোষাক পরিতে ভালবাসি, আমার প্রিয়জনকে সেই পোষাক পরাইতে ইচ্ছা হয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য। শৈবেরা ভগবানকে বিল্বপত্র দেয়, শাক্তেরা রাঙ্গা জবা দেয়, বৈষ্ণবেরা সচন্দন তুলসী দেয়, ইত্যাদি। মনোমত প্রতিমা গড়াইয়া আবাহন করিতে হইবে। "ইহা গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া কাতরে ডাকিতে হইবে। প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভগবান প্রতিমামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলে দেখিবে এক বিমল জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে। অতি বিনীতভাবে, কাতর কণ্ঠে, ভক্তিগদ্গদচিত্তে তোমায় বলিতে হইবে—"আমি অতি-ক্ষুদ্রপ্রাণী, কাঙ্গাল, কোথায় কি পাব, ভগবান। তুমি রাজার গৃহে কত উপাদেয় সামগ্রী উপভোগ কর, আমি দীন, দুঃখী, সে সমস্ত

উপভোগ্য কোথায় পাব? দয়া করে কাঙ্গালের কুটীরে এসেছ, দয়া করে বিদুরের খুদ, দরিদ্রের শাকান্ন ভোজন কর। আমি কৃতার্থ হই।"

এখন আর সেকালের ভক্তি নাই। যাঁহার স্ত্রীর গায়ে পাঁচ হাজার টাকার গহনা, আসন অঙ্গুরীর স্থানে তিনিও পয়সায় ১৬টা যে আংটী বিক্রয় হয় তাহাই দিয়া থাকেন। এই কি ভক্তি, না এই পূজা? সেই জন্যই পূজার ফল হয় না। ভক্তিমান শাক্ত, প্রাণের ভিতর থেকে ভক্তিভরে যখন মা মা করিয়া ডাকিতে থাকে, জগন্মাতার কাছে সে ডাক পঁহুছে। ভক্তের সম্মুখে যার জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, ভক্তের চক্ষু প্রতিমার পানে, প্রাণে ভক্তির উচ্ছ্বাস ভরা, মুখে মা মা শব্দ। তখন ভক্তের মনের ভাব কি? তুমি কি মনে কর, যে রাংতা-মোড়া রংকরা খড়দড়ী মাটীতে নির্ম্মিত মূর্ত্তিটী তাহার চক্ষের ও মনের বিষয়ীভূত সামগ্রী? তাহা নহে।

ভক্তের মনে অন্যভাব। ভক্ত, সাধক জড়মূর্ত্তির ধ্যান করিতেছে না। জড়ের ভিতরে যিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কালে উপস্থিত হইয়াছেন, ভক্ত সেই জগন্মোহিনী মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সেই আদ্যাশক্তিকেই দৃষ্টি করিতেছে। চসমা দ্বারা আমরা বাহিরের জিনিস দেখি। দৃষ্টিটা প্রথমে কাচের উপরেই পড়ে। কিন্তু চসমার কাচ ত আমরা দেখি না বা লক্ষ্য করি না—লক্ষ্য করি সেই বাহিরের জিনিস, দেখি তাই। মাটি নির্ম্মিত মূর্ত্তি চসমার কাচের স্বরূপ; কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য বিষয় চসমার বাহিরের জিনিস, সেই আদ্যাশক্তি যিনি নিরাকার, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ আকার নাই, যিনি ছোট বড় সকল রকম আকারই গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছাময়ী; যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তখন তাহাই

করেন। ভক্তের সম্মুখে যে মূর্ত্তি তাহাই ভগবানের সাকার মূর্ত্তি। ভগবান তাহাতে অধিষ্ঠান করেন। ভক্ত সেই মূর্ত্তি দেখেও পূজা করে—জাগ্রত অবস্থায়। তন্দ্রা অবস্থাতে ভক্ত সেই মূর্ত্তি দেখিতেছে ও পূজা করিতেছে। সুপ্তির অবস্থাতে ভক্ত মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, তাহার ছায়া মাত্র দেখে। শেষে যখন ভক্তের সুষুপ্তি অবস্থা হয়, (কেবল বুদ্ধি থাকে) তখন ভক্ত মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি বা তাহার ছায়া কিছুই দেখে না—দেখে কেবল চৈতন্যময় জ্ঞান—শুদ্ধ চৈতন্য, নির্গুণ ব্রহ্মের শক্তি। বড় ঘরের ঝি পর্দ্দার চিকের আড়ালে থাকেন; পর্দ্দা বা চিক সরাইলে তবে তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখা যায়। অবিদ্যা রূপ চিক অপসৃত না হইলে ভগবানকে দেখা যায় না। প্রতিমূর্ত্তি পূজিতে পূজিতে মন উন্নত হইতে থাকে। যখন উন্নতির চরম হইবে, তখন ভক্ত প্রতিমূর্ত্তির ভিতরে ও বাহিরে যে নিরাকার শুদ্ধ চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। ভক্ত হও, সাধক হও, সিদ্ধ হও, প্রতিমার আবশ্যকতা হইবে না। যত দিন সে অবস্থা না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত তোমায় প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতে হইবে।

মন্ত্র রহস্য।

(৬)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অগ্রে উপাসনার নিমিত্ত আসন প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপরে মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিবার বিধি। ভগবান সর্ব্বশক্তির ও সর্ব্ব গুণের আধার। মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার গুণাবলী ও শক্তি-নিচয়কে উদ্রেক করা যায়। আমাদের আত্মাতে যে সমুদয়

গুণ ও শক্তি আছে মন্ত্র জপ করিলে তাহারাও উদ্রিক্ত হইয়া থাকে।

এখন, মন্ত্র কি, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। মন্ত্র আর কিছুই নহে, বাক্য মাত্র, অর্থযুক্ত শব্দ। মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, শব্দ উচ্চারিত হয়, বাক্যের স্ফূরণ হয়।

শব্দ-নিঃসরণ-যন্ত্রের নাম বাক্ যন্ত্র। কণ্ঠনালীর মুখে ঐ বাক্ যন্ত্র অবস্থিত। ঐ যন্ত্রে মাংসপেশী আছে। সে গুলি তারের ন্যায় সটান ভাবে সাজান। ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু উদ্গত হইয়া কণ্ঠনালীর মুখে পহুছে; পরে বাক্ যন্ত্রের মধ্যে শব্দিত হইয়া বহির্গত হয়। আমরা স্পষ্ট স্বর, স্পষ্ট কথা শুনিয়া থাকি। সকলকার এ যন্ত্র সম্পূর্ণ নহে। অনেকের বাক্ যন্ত্রে দোষ আছে; সেই জন্য কোন কোন লোকের "শ" বলিতে গিয়া "হ" বাহির হয়; তাহারা "সপ্তাহকে" "হপ্তা" বলিয়া ফেলে। কাহারও বা "ড়" বলিতে বলিতে গিয়া "র" বাহির হয়। আবার কেহ কেহ "র" বলিতে গিয়া "ড়" বলিয়া ফেলে। কাহারও মুখে "জ"র স্থানে ইংরাজি বর্ণমালার শেষবর্ণ (z) উচ্চারিত হয়। চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকে সাফল্য সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

শব্দ-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে ভাষা-বিজ্ঞান আসিয়া পড়িতেছে। বাক্য কথন—ভাষা। অর্থযুক্ত শব্দের যোজনা দ্বারা বাক্য রচিত। শব্দে ও অর্থে নিকট সম্বন্ধ আছে; ঐ সম্বন্ধকে বাচ্য বাচক সম্বন্ধ কহে। পদ দুই প্রকার। যে পদে শব্দের সহিত অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহাকে স্বাভাবিক পদ বলে। আর যে পদের শব্দার্থ ঘটান, স্বাভাবিক নহে, তাহাকে অস্বাভাবিক পদ বলা যায়। দু দশ জনে একত্রে মিলিয়া কোন পদের শব্দার্থ স্থির করিলাম। সেই

পদকে অস্বাভাবিক পদ বলে (Conventional)। অমুক দ্রব্য বুঝিতে হইলে অমুক পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। জল, তড়িৎ, মা, বাবা, অগ্নি এগুলি স্বাভাবিক পদ। বারি, জীবন, চপলা, বহ্নি এগুলি অস্বাভাবিক পদ। স্বাভাবিক-পদ-ঘটিত যে সকল ভাষা, তাহাদের মধ্যে ঐক্য আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন সকল ভাষারই পরস্পর মিল আছে—দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ সকল জাতির ভাষায় মিল আছে। কথাটা কমন কেমন ঠেকে। জীব শ্রেণী ছাড়িয়া দিয়া, কেবল মানবজাতির কথা ধর। একা মানুষই কত রকম। ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীতে কত দেশ, কত জাতি, কত ভাষা।

ইংরাজি, পার্শি, আর্ব্বী, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ইত্যাদি নানা ভাষা রহিয়াছে। কিন্তু সাম্য কোথায়, মিল কৈ? মিল আছে। ভাষায় ভাষায় আকার-গত বৈষম্য থাকিলেও মূলে এক। তাহার কারণ শব্দের উৎপত্তিস্থল এক বই দুই নহে। মূল এক, প্রকৃতি এক। ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষা চাই। বাক্‌যন্ত্রে শব্দ উচ্চারিত হয়, তদ্দ্বারা ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। চক্ষু, হস্ত দ্বারাও ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। ঘাড় নাড়াতেও ভাব ব্যক্ত হয়। বলি-দানের পূর্ব্বে পাঠার আর্ত্তনাদ শুনিয়া পাঁঠার তৎকালীন মনোগত ভাব বেশ বুঝা যায়। বৎসহারা ধেনুর "হাম্বা" রব তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করে। যিনি ম্যাড়ার লড়াই দেখিয়াছেন তিনি জানেন ম্যাড়া রাগিলে কিরূপ শব্দ করে। কাকের ভাষা, বুল্‌-বুলের ভাষা চিড়িমারগণ বিলক্ষণ বুঝে। সকল ভাষার মূল এক, প্রকৃতি এক। হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি ভাব ব্যক্ত করিবার কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে। সেগুলি সাধারণ। পদগত পার্থক্য থাকিলেও

অর্থগত পার্থক্য নাই। কোন দ্রব্য দেখিবা মাত্র আমার দর্শন-ইন্দ্রিয়ে একটা ঘাত (Shock) লাগে। স্নায়ুদিয়া সেই বেগ মস্তিষ্কে যায়। আমি বুঝিয়া লই বাহিরে অমুক জিনিস আছে। যে কোন প্রবাহ বাহির হইতে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহার অনুরূপ আর একটী বেগ (প্রতিবেগ) প্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসে। আসিবার সময় ফুসফুসের বায়ুকে বিতাড়িত করে। ঐ বায়ু ফুসফুস হইতে উদ্গত হইয়া বাক্ যন্ত্রের মধ্য দিয়া শব্দাকারে বহির্গত হয়। সেই শব্দ, ঐ বেগের, ঐ বলের অনুকারী। সকল দ্রব্যেই গূঢ় শক্তি নিহিত আছে। সেই শক্তি উদ্রিক্ত হইয়া তাড়িত-প্রবাহের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করে। অন্তর হইতে সেই শক্তির প্রতি-প্রবাহ ছুটিয়া আইসে ও বহিস্থ দ্রব্যের নিহিত-শক্তি সমূহে মিলিয়া যায়। এই কারণে দ্রব্যের নাম দ্রব্যের শক্তিগুণ বাচক। জল দেখিলে বা স্পর্শ করিলে যে শক্তি আমার দেহে কার্য্য করে সেই শক্তির ক্রিয়া আমার অন্তরে স্নায়ু-মণ্ডলীতে হইতে থাকিবে। দ্রব্যে শক্তি আছে, দ্রব্য-বাচক শব্দ সেই শক্তির ক্রিয়া-ফল। শব্দেও শক্তি আছে; বাক্য শক্তি-সম্পন্ন ও শক্তি-উৎপাদক। কেহ তোমায় গালি দিলে তোমার রাগ হয় কেন? কেহ মধুর কথা বলিলে তোমার মনে আনন্দ হয় কেন? কথায়, শোক, দুঃখ উপস্থিত হয় ত? অতএব কথা, বাক্য, শব্দ নির্জ্জীব, জড়, মনে করিও না। শব্দে, কথায়, বাক্যে শক্তি আছে; ফুটাইতে জানিলে সে শক্তি ফুটে। বাক্য দ্বারা, শব্দ-প্রয়োগ দ্বারা অনেক রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে।

মন্ত্রগুলি অর্থ-যুক্ত-শব্দ-রচিত বাক্য। মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ফল হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি শব্দে শক্তি আছে, সুতরাং মন্ত্রে শক্তি

আছে। যে ব্যক্তি সিদ্ধ, সে মন্ত্রের শক্তি ফুটাইতে পারে। মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, শক্তি ক্রিয়া করিতে থাকে। ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে ক্রিয়ার ফল পাওয়া যায়।

মন্ত্র চারি প্রকার—সুগন্ধি, সিদ্ধ, সাধ্য ও বিরোধী। মন্ত্রের তিনটী নাম আছে যথা প্রণব, তার, মন্ত্র।

প্রণব=ওঁ, অর্থাৎ ওঁ একটী মন্ত্র। ইহাতে আছে অ+উ+ম+নাদ+বিন্দু। প্রণব উচ্চারণে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে, অপর জাতির অধিকার নাই। স্ত্রীগণ ও অপর জাতিরা অন্য এক প্রণব উচ্চারণ করিতে পারে।

প্রণব অর্থে বুঝিতে হইবে, যাহা প্রাণকে নিম্নস্থান হইতে তুলিয়া উচ্চস্থানে লইয়া যায়।

"অ" মুলাধারে; "উ" মণিপুর চক্রে, "ম" হৃদ্ পদ্মে; "নাদ" কপালে; "বিন্দু" ব্রহ্মরন্ধ্রে। প্রণব বা ওঁ উচ্চারণ করিলে শক্তি নিচয় উদ্রিক্ত হইল। সেই শক্তি-প্রবাহ মুলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে ছুটিল। পথে নানা চক্র বা ঘাট আছে। শক্তি প্রবাহ চক্রে চক্রে বা ঘাটে ঘাটে ঠেকিয়া চলিল। তাহাতে প্রতি চক্রে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আরম্ভ হইল, শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল।

তার—দুঃখ, শোক, পাপ, অবসাদ হইতে আত্মাকে মুক্ত করে; অর্থাৎ মন্ত্র জপ করিলে শোক, দুঃখ, পাপ তাপ, অবসাদ কিছুই থাকে না, সকলই দূর হয়।

মন্ত্র—যাহা মনে ধ্যান কালীন সকল ক্লেশ ও ব্যসনকে দূর করে।

মন্ত্রের বীজ আছে। কং একটী শক্তি-বীজ মন্ত্র। ক্রং= ক+অ+ম্ং। এই বীজটী উচ্চারণ করিলে তিনটী ঘাটে ঠেকে,

তিনটী চক্রকে স্পর্শ করে। স্পর্শ করিবা মাত্র সেই সেই চক্রে তাড়িৎক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও বল অনুসারে মন্ত্র বাছিয়া লইতে হয় ও জপ করিতে হয়। গুরু উপযুক্ত মন্ত্র উপযুক্ত শিষ্যকে দান করেন। বিচক্ষণ ডাক্তার রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ; সদ্‌গুরু শিষ্য নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম। ডাক্তার সুব্যবস্থা স্থির করেন; গুরুও উপযুক্ত বীজ-মন্ত্রে শিষ্যকে দীক্ষিত করেন। গুরুর দায়িত্ব ভয়ানক; শিষ্যের সমস্ত ভার গুরুর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। গুরুর ভ্রমে শিষ্যের সমূহ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। আমার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও বলের অনুযায়ী আমার মন্ত্র হওয়া চাই। যদি গুরু আমায় বিপরীত মন্ত্র দেন তাহা হইলে আমার চক্রে চক্রে আমার প্রকৃতি-বিরোধী তাড়িৎ-ক্রিয়া হইতে থাকিবে। তাহাতে আমার উৎকট রোগ হইবার সম্ভাবনা। গুরুর দোষে লোক পাগল হইয়া যায়। বিরোধী মন্ত্র জপ করিতে গিয়া কাহারও কাহারও হাঁপানি ও যক্ষ্মা রোগ উপস্থিত হয়, কেহ কেহ মরিয়া যায়। কাহারও শক্তি-মন্ত্র; কাহারও বিষ্ণু-মন্ত্র; কাহারও শিব-মন্ত্র; কাহারও রাম-মন্ত্র। এক এক শ্রেণীর মন্ত্রে নানা ভাগ আছে। একা, শক্তি-মন্ত্রই নানারূপ—কালী, শ্যামা, দুর্গা, বগলা, তারা ইত্যাদি ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন বীজ-মন্ত্র। সেইরূপ বিষ্ণু-মন্ত্রে, হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ ইত্যাদি বীজ-মন্ত্র আছে। দুঃখের কথা, ভাল গুরু নাই। হা ভারত! বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের দেশে আজ সদ্‌গুরু মেলা ভার হইয়াছে। কি আক্ষেপ, কি পরিতাপ! আর্য্যসন্তানগণ, এক বার পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা, তপোবনের কথা স্মরণ কর, ধর্ম্মমালিন্য বিদূরিত হউক।

—০—

প্রণবমূলে বিশ্বতরু।

(প্রথম প্রস্তাব।)

(৭)

এই বিশাল বিশ্বতরুর মূল, প্রণব। এই বিশ্বজগৎ প্রণব হইতে সমুৎপন্ন। প্রণবের পরিণতি এই প্রপঞ্চ। বিরাটমূর্ত্তি—এই বিশ্ব-চরাচর, প্রণবের পূর্ণ বিকাশ। প্রণব কি? প্রণব—ওঁ = অ + উ + ম + ঁ। উপনিষদে ও হিন্দুর অপর শাস্ত্রগ্রন্থে প্রণব মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, যথা :—

যথাপ্রযুক্ত ওঙ্কারঃ প্রতিনির্য্যাতি মূর্দ্ধনি।
তথোঙ্কারময়ো যোগীত্বক্ষরে ত্বক্ষরোভবেৎ॥
ওমিত্যেতৎত্রয়োদেবাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
বিষ্ণুব্র্ব্রহ্মাহরশ্চৈবঋক্‌সামানিযজুংষিচ॥
মাত্রাঃসার্দ্ধাশ্চতিস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।
তত্র যুক্তস্তু যো যোগী সতল্লয়মবাপ্নুয়াৎ॥
ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কার সংজ্ঞিতম্।
যস্তু বেদনরঃ সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ॥
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ত্যক্ত ত্রিবিধ বন্ধনঃ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মনি লয়ং পরমে পরমাত্মনি॥

অন্বার্থ :—

ওঙ্কার প্রযুক্ত হইয়া যেমন মস্তকে প্রতিগমন করে, তেমনি যোগী অক্ষরে অক্ষরে ওঙ্কারময় হইয়া থাকেন। ওঁ—এই অক্ষরেই তিন বেদ, তিন অগ্নি, তিন লোক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এই

তিন বিধাতা এবং ঋক সাম যজুঃ স্বরূপ। পরমার্থতঃ ইহা সার্দ্ধ তিন মাত্রা জানিবে। যে যোগী তাহাতে নিযুক্ত হন, তিনি তাহাতেই লয় পান। এই প্রকারে যিনি ওঁকারাভিধেয় অক্ষর স্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্যকরূপে অবগত ও তাহার ধ্যানে সংযুক্ত হন, তিনি সংসারচক্র অতিক্রম ও ত্রিবিধ বন্ধন পরিহার করিয়া সেই পরমাত্মস্বরূপ পরব্রহ্মতেই লয় পাইয়া থাকেন

এতক্ষণে বুঝিলাম প্রণবই স্বয়ং ভগবান; প্রণবই চিৎশক্তি! ভূর্ভুব এবং স্বর্লোক ব্যাপিয়া প্রণব রহিয়াছেন। অন্তর্জগতেও প্রণব, বহির্জগতেও প্রণব, জগৎ প্রণবময়। তুমি বলিতে পার, কোথা প্রণব নাই? কোথায় চৈতন্য শক্তির অভাব? জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অগ্নিতে, বায়ুতে—সেই চৈতন্য শক্তি। ধরিত্রীর গর্ভে ঘোর অন্ধকারে দেখিবে খনি। খনিতে ধাতু। সে ধাতুও চিৎশক্তি-সম্পন্ন। বালুকণার মধ্যেও সেই চৈতন্যশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, স্বর্ণরেণুর ন্যায় ক্ষুদ্রতম পরমাণুতে চৈতন্য শক্তি নাই; সে রেণুগুলি সচেতন নহে অচেতন, জীবিত নহে মৃত। হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র বলে, এ রেণুতেও চৈতন্যশক্তি আছে। এ কথার প্রমাণ—স্ফটিক। স্ফটিকে, কোণ ও রেখার অপূর্ব্ব সন্নিবেশ বিধাতার কৃত। সেই জন্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক শোক্রোক্ত-শিষ্য প্লেতো বলিয়া গিয়াছেন "বিশ্ব, বিধাতার জ্যামিতি গ্রন্থ (God geometrizes)।" ধন্য সেই দেবশিল্পীর শিল্পকৌশল। দ্বিতীয় প্রমাণ—যাবতীয় যন্ত্র [যেমন ঘড়ীর কল] কিছুকাল কাজ করে বা চলে, শেষে বিকল হইয়া পড়ে। জীবের দেহযন্ত্র যেরূপ কাজ করিয়া অবসন্ন হয়, বিশ্রাম আবশ্যক হয়, সেইরূপ যন্ত্র মাত্রেরই অবসাদকালে বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজন.

হইয়া থাকে। এখন দেখা গেল, খনিজ পদার্থেও চিৎশক্তি আছে।

কেবল শক্তি থাকিলেই হইল না, শক্তির ক্রিয়া চাই। শক্তি ক্রিয়া করিবে কোথায়?—ক্ষেত্রে, সুতবাং ক্ষেত্রের আবশ্যক। ক্ষেত্রে শক্তির ক্রিয়া হইবে। প্রস্তরখণ্ডে জীবনীশক্তি গুপ্তভাবে নিহিত আছে, সময় উপস্থিত হইলে সেই শক্তির বিকাশ হয়। বৈশ্বানর, প্রকৃতিব প্রতিকৃতি। পাহাড়, নদী, নদ, প্রাণী ইহাব স্থূল বিকাশ। এই বৈশ্বানব হইতে পঞ্চ স্থূল ভূতেব উদ্ভব। প্রথমে আকাশ (Ether), তাহাব পর বায়ু (Ultragaseous state), তাহাব পর অগ্নি (gaseous state); তাহার পব জল (liquid state); শেষে পৃথিবী (solid state); সেই চৈতন্যশক্তি যথন স্থূল ভূতে পরিণত ও পবিব্যক্ত হইলেন, তখন তাঁহাব নাম হইল বিবাট পুরুষ। সেই মহতী শক্তিব পূর্ণ বিকাশ, এই প্রপঞ্চ। বালুকা কণাতে, স্বর্ণরেণুতে, ত্রসবেণুতে, সেই শক্তি বিদ্যমান। উদ্ভিদ বাজ্যেও সেই শক্তির বিকাশ। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজে সেই চৈতন্যশক্তি নিহিত। ইহাব প্রমাণ এই যে, কোন কোন লতাব, কোন কোন বৃক্ষেব পত্রে, শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভাবে সংকোচন ও সম্প্রসাবণ কার্য্য হইতে দেখা যায়। কীটভুক লতা (Pitcher) ও লজ্জাবতী লতার কথা সকলেই অবগত আছেন।

খনিজ পদার্থকে অচেতন বলা যাইতে পারে না। উদ্ভিদ পদার্থও অচেতন নহে। উদ্ভিদ জগতে, অবরোধ (Sensation) লক্ষণ দ্বারা বীজকোসের সজীবতা প্রমাণিত হইল। ক্রমে প্রাণী-জগতে আসিয়া পড়িলাম। এই জগত দুইভাগে বিভক্ত—নিকৃষ্ট

জীব ও উৎকৃষ্ট জীব। নিকৃষ্ট জীবে (মৎস্য, পশু, পক্ষী) সেই চৈতন্যশক্তি বিরাজ করিতেছে। অবরোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাহাদের জীবশক্তির পরিচয় দিতেছে, কিন্তু ইহাদের মন বা বুদ্ধি নাই।

উৎকৃষ্ট জীব, মানব। সেই চৈতন্যশক্তি, মানবেতে বিকশিত হইয়াছে। প্রমাণ—মানুষের চঞ্চলতা, অবরোধ, জ্ঞান, বাসনা, কামনা, প্রবৃত্তি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই সকল শক্তি আছে। মন কি? বাহ্য বস্তুর সহিত অন্তঃপ্রজ্ঞার যে সম্বন্ধ-যোজনা তাহাকেই মন কহে। ইহার ইংরাজি নাম Consciousness. চিত্ত—স্মৃতি (Memory)। বুদ্ধি—(Reason) যে শক্তিবলে ইন্দ্রিয়-গত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অবরোধগুলির বিচার করা যায়, এবং যাহার বিচারফল, নূতন সিদ্ধান্ত, সেই শক্তিকে বুদ্ধি কহে। মনের বিকাশ হইলেই যে উন্নতির চরম হইল, এ কথা মনে করিবে না। মন বা Consciousnessএর পরিণতি হইল Self-consciousness বা অহংজ্ঞান।

এতক্ষণে (Evolution Theory) এক ভাগ মাত্র শেষ হইল। স্থূল জগতে, খনিজ পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া মানব পর্য্যন্ত, স্তরে স্তরে কিরূপে ক্রমোন্নতি হইল, তাহা দেখাইলাম। অর্থাৎ সেই চৈতন্যশক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া কিরূপে স্থূল শরীরে বিকাশ পাইলেন, তাহা বুঝাইলাম। এই তত্ত্বের প্রথম সোপান—স্থূলের বিকাশ।

এখন দ্বিতীয় সোপানে উঠিলাম, সূক্ষ্মের বিকাশ সম্বন্ধে কিছু বলিব। [illegible]জ্ঞান-বিকাশ প্রথম সোপানের শেষ সীমা। দ্বিতীয় সোপানে তদূর্দ্ধে অহংজ্ঞানের বিকাশ। স্থূলরাজ্য অতিক্রম না [illegible]লে সূক্ষ্মজগতে যাওয়া যায় না। অতএব বুঝিতে

হইবে যে, যিনি দ্বিতীয় সোপানে উঠিয়াছেন, তাঁহার স্থূল শরীর নাই, সূক্ষ্ম শরীর হইয়াছে, অর্থাৎ সেই চৈতন্যশক্তি স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহে আশ্রয় লইয়াছে। এখন ইহার নাম আর বৈশ্বানর নহে, এখন ইনি হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত। হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম শরীরে। সূক্ষ্ম শরীরীরা যে জগতে বাস করে, সে জগতকে অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক কহে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিরিঞ্চি বা ব্রহ্মা। এই জগতে অপঞ্চীকৃত ভূতে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উপদেবতাগণ এই জগতে বাস করেন। এই ভুবর্লোককে পিতৃলোকও কহে; যে হেতু আমাদের পরলোকগত পিতৃগণ এই রাজ্যে কিছু দিনের জন্য বাস করেন। এই লোকে প্রেতপুরী আছে, সেই প্রেতপুরী ভূতযোনির আশ্রয়। সুতরাং এ জগতে অনেক বিভীষিকা আছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সকলকেই আতিবাহিক দেহে এই লোকে আসিতে হয়। জীবিত অবস্থাতেও এ জগতে আসা যাইতে পারে। মূর্চ্ছাবস্থা বা নিদ্রাবস্থাতে কিঞ্চিৎকালের জন্য স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহে যোগীরা এই রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। অনুশীলন দ্বারা সাধক, সন্ন্যাসী, যোগী, যতি, যোগমার্গাবলম্বী মহাত্মাগণ মনে করিলেই সূক্ষ্ম দেহে পিতৃলোকে গমন করিতে পারেন।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় সোপানে কত দূর উন্নতি হইল, উত্তরে এই কথা বলিব, শরীর ইতিপূর্ব্বে স্থূল ছিল, এখন সূক্ষ্ম হইল। পূর্ণমাত্রায় মানস-বিকাশ এই সোপানের মূল-শিক্ষা—অহংজ্ঞানের বিকাশ এই সোপানের প্রধান লক্ষ্য। এই সোপানে উঠিলে এই সকল তত্ত্ব জানিবার অভিলাষ জন্মে।

সত্য কি? অসত্য কি? বস্তু কি? অবস্তু কি? আমি কে? কোথা ছিলাম? কোথা আসিয়াছি? কোথা যাইব? কেন আসিলাম? কেনই বা যাইব? এ সকল তত্ত্ব জানিবার পূর্ব্বে দেহ কি, জানা চাই। দেহকে যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা অনেক বিষয় জানিতে পারি। দেহ-যন্ত্রে নবদ্বার আছে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথ। কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে দেখিবার, জানিবার, শিখিবার বিষয় এত অধিক যে, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে কুলায় না। স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা স্থূল বিষয়েরই জ্ঞান জন্মে, সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। চর্ম্মচক্ষু দ্বারা কেবল ৭টী মাত্র রং দেখিতে পাওয়া যায়; অবশিষ্ট রং গুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই অবশিষ্ট রংগুলি বায়বীয় কম্পন (Etherial vibrations) অর্থাৎ সে রংগুলি শব্দাত্মক। সিদ্ধান্ত হইল, বর্ণের পরিণতি শব্দ। আমরা স্থূল দেহে থাকিয়া যে সকল শব্দ শুনিতে পাই, সে শব্দগুলি স্থূল; সূক্ষ্ম শব্দ আমরা শুনিতে পাই না।* সেই সূক্ষ্ম শব্দগুলি বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। মন্ত্রতত্ত্বে ইহার সবিস্তার বিচার করিব। আলোকের নিকটে একটী রঞ্জিত পদার্থ রাখিলে নানা প্রকার সুর শুনা যায়। বিজ্ঞান একথা স্বীকার করিয়া থাকে। এখন দেখা গেল, শব্দ বর্ণবিশেষ অর্থাৎ

---

* Prof. Jagadis Chandra Bose, M.A., D.Sc. says—"We hear little and see still less. Our range of perception of sound extends through only 11 octaves. There are many notes which we can not hear. Our range of vision is still more limited. A single octave of etherial notes is all that is visible to us.' The lights we see are few but the invisible lights are many."

বর্ণের পরিণতি শব্দ। শব্দ বিশেষ বর্ণ; অর্থাৎ শব্দের পরিণতি বর্ণ। তবেই দেখুন, আমাদের দেহ-যন্ত্র অসম্পূর্ণ, ইন্দ্রিয়গুলিও অসম্পূর্ণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়াগত জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। ইন্দ্রিয়াগত জ্ঞান বিশুদ্ধ নহে, তাহাকে জ্ঞানের বিকার বলিলেও চলে।

স্থূলদর্শী মানব স্থূল জ্ঞানের অধিকারী। সূক্ষ্মদর্শী না হইলে সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না। আলোক রহস্য, উত্তাপ রহস্য, বিদ্যুৎ রহস্য, চুম্বক রহস্য, এ সকল রহস্য উদ্ভেদ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। স্থূলদর্শী মন না জানে না, সত্য কি? বস্তু কি? অহং কে? সৎ বা অহং জানিতে হইলে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে না, নবদ্বারে কুলাইবে না। সেজন্য ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা দশম দ্বারের আবশ্যক। সেই দশম দ্বার কোথা? তদুত্তরে ব্রহ্মবিদ বলেন ভ্রূযুগলের সন্ধিস্থলে সেই দশম দ্বার আছে তাহার নাম ঊর্দ্ধযোনি। যোনি মুদ্রার সাহায্যে সেই দ্বারে উপনীত হইতে হইবে। তৎ মধ্যে ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু আছে। তাহাকে astral light কহে। সেই আলোকের সাহায্যে অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। সেই আলোকময় নিভৃত বক্ষে অন্তরাত্মা (Self) বিরাজ করিতেছেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় বস্তু আলোকমণ্ডলে পরিবেষ্টিত। স্নায়ুমণ্ডল ঐ আলোকমণ্ডলের অন্তর্নিবিষ্ট। ইতিপূর্ব্বে সূক্ষ্ম দেহের কথা বলিয়াছি, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ কি? সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহের প্রতিরূপ। প্রভেদ এই—স্থূল দেহে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন স্থানে আপন আপন কার্য্য করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম দেহে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় নাই, এক অঙ্গ দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয়েরই কাজ হইয়া থাকে। প্রথমে, সূক্ষ্ম শরীর নিস্তেজ ও দীপ্তি-শূন্য থাকে। ক্রমে অনুশীলন দ্বারা উহার

উন্মেষ হয়। যখন সাধকের হৃদ্‌পদ্মে ধর্ম্মজ্যোতির বিকাশ হয়, তখনই তাঁহার হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। আত্মারাম তখন সেই বিকশিত কমলে অধিষ্ঠান করেন। এই উন্নতি লাভ করিবার পূর্ব্বে, যোগীর অবস্থা গর্ব্বিণীর অবস্থার সদৃশ হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধরেতাঃ যোগী ঊর্দ্ধযোনিতে বীজ স্থাপন করিলে তাহার প্রকৃতিগত জীবনের বৈলক্ষণ্য ঘটে। গর্ব্বিণীর যেরূপ সকল আহারীয় দ্রব্যে অরুচি জন্মে, যোগীরও সংসারে বৈরাগ্য জন্মে। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে গর্ব্বিণীর নিকট ধাত্রী আইসে; চরমকাল উপস্থিত হইলে সাধকের নিকট গুরু আসিয়া উপস্থিত হন। শেষে গর্ব্বিণী ধাত্রীর সাহায্যে প্রসব করেন। সাধকও গুরুর প্রসাদে মুক্তিলাভ করেন। তখন সূক্ষ্ম শরীরী জীব স্থূল দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অতীন্দ্রিয় রেণুর স্থায় শূন্যমার্গে ভাসিয়া বেড়ান।

এতক্ষণে জ্ঞানচক্ষু ফুটিল, মায়ার ঘোর কাটিল, জ্ঞানী বুঝিলেন, "অহং কে?" জ্ঞানী জানিলেন, "সৎ কি?" বুঝিলেন—অহং বা সৎ আর কেহই নহেন, সেই চৈতন্যশক্তি,—যিনি স্থূলে বৈশ্বানর, সূক্ষ্মে হিরণ্যগর্ভ, কারণে সূত্রাত্মা বা অহং। তদূর্দ্ধে স্বয়ং ব্রহ্ম। জ্ঞানী বুঝিলেন, অহংই বস্তু, আর সমুদায় অবস্তু, অনিত্য, অসার; বুঝিলেন, স্থূল দেহ অবস্তু; আর বৃক্ষ-লতা-গিরি-নদী-কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী-মানব-পরিপূর্ণ এই যে প্রপঞ্চ ইহাও অসার, অবস্তু, অনিত্য। এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে, যদি অহংই সার হইল, আর সমুদায় অসার, তবে এ অসার বিশ্ব-সংসার সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। জগতে যত পদার্থ আছে, সে সমুদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে;

কতকগুলি সদৃশ, আর কতকগুলি বিসদৃশ। জ্ঞানের উৎপত্তি স্থলে সাম্য ও বৈষম্যের বিচার। ঘোড়াকে আমরা ঘোড়াই বলিয়া ডাকি, ঘোড়াকে মাছ বলি না। বৃক্ষকে বৃক্ষই বলিয়া থাকি, বৃক্ষকে পর্ব্বত বলি না। নদীকে নদী বলিয়া থাকি, নদীকে মানুষ বলি না। তাহার কারণ, মাছ কি, পর্ব্বত কি, মানুষ কি, তাহা আমরা অগ্রেই অবগত আছি। দুঃখের জ্ঞান না থাকিলে সুখের জ্ঞান হইতে পারে না। সুখ যে দুঃখ নহে, এ কথা আমি আগে না জানিলে কেমন করিয়া বলিব অমুক ব্যক্তি সুখী? অন্ধকারের জ্ঞান না থাকিলে আলোকের জ্ঞান হইতে পারে না। মন্দের জ্ঞান না থাকিলে ভালর জ্ঞান হয় না। মিথ্যার জ্ঞান না থাকিলে সত্যের জ্ঞান হইতে পারে না। অবস্তুর জ্ঞান না থাকিলে বস্তুর জ্ঞান হয় না। স্থূল প্রপঞ্চ না থাকিলে অহং জ্ঞান হয় না। সেই নিমিত্ত বিশ্বসংসার অসার, অনিত্য, অবস্তু হইলেও, এ সংসার সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। এই অবস্তু সংসার হইতে অহং বস্তুর জ্ঞান হইবে বলিয়াই এই স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি।

প্রণবমূলে বিশ্বতরু।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(৮)

পাশ্চাত্যদর্শন পরব্রহ্মকে গুণসমষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। বাস্তবিক তিনি গুণসমষ্টি নহেন; তিনি সকল গুণের প্রভব। পরব্রহ্মকে Soul বা আত্মা বলা যায় না; তাহার কাঁঁধী Soul

নির্ব্বিকার নহে, পরব্রহ্ম নির্ব্বিকার। পরব্রহ্ম কেবলমাত্র জ্ঞান নহেন বা জ্ঞাতা নহেন, বা জ্ঞেয় নহেন; অথচ তিনি একাধারেই তিন। পরব্রহ্ম is the field of ideation in passivity: কিন্তু ঈশ্বর is the germ of ideation and centre of activity। যোগনিদ্রাকালে ঈশ্বর স্বীয় শক্তিদ্বয়কে (দৈবী প্রকৃতি ও মূলা প্রকৃতিকে) আত্মদেহে সংহরণ পূর্ব্বক পরব্রহ্মে বিলীন হয়েন। সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যে প্রকৃতি এবং উক্ত গুণত্রয়ের বৈষম্য ঘটিলে মায়ার সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের সুষুপ্তির অবস্থা কল্পনা করিলে, পরব্রহ্মের উপলব্ধি হইতে পারে। Undifferentiated state বা একত্বে নামের পার্থক্য থাকে না। সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা বুঝাইতে হইলে, পরব্রহ্মকে শূন্য বলিতে হইবে। শূন্যের কোন মূল্য নাই সত্য, কিন্তু অপর রাশির মূল্য, শূন্য সংযোগে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম অনন্ত, অসীম, এই হেতু শূন্যই পরব্রহ্মের যথার্থ অবভাবক। ঈশ্বরের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, বিন্দু। সেই বিন্দু, উপাধি সংযোগে অকূল সিন্ধুতে পরিণত হয়। সে সিন্ধু দয়ার, জ্ঞানের, গুণের, শক্তির ও আলোকের। পরব্রহ্মে ও ঈশ্বরে যে সম্বন্ধ, তাহা কাল্পনিক নহে; তাহা স্থির, নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ। তাহার সঙ্কেত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া দেয়, ঈশ্বরই জীব ও ব্রহ্মের সংযোজন কর্ত্তা। সাধারণ জ্ঞান এই—সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর, আর নির্গুণ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম। ঈশ্বরের স্বরূপ কি তাহা বলা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সচ্চিদানন্দ। উপনিষদ ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কেবল বলে "নেতি, নেতি—!" গীতাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঈশ্বর ও পরমাত্মা একই বস্তু—

অনেকবাহূদরবক্ত্র নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং নমধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপং॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বর রাজা, প্রকৃতি তাঁহার রাজ্য; দৈবী ও মূলাপ্রকৃতিকে তিনি শাসন করিয়া থাকেন। দৈবী প্রকৃতির চিহ্ন, ঊর্দ্ধশির ত্রিভুজ—এক ভুজ প্রাণ, এক ভুজ জ্ঞান, আর এক ভুজ আলোক্। Primordial matter বা মূলাপ্রকৃতির চিহ্ন, অধঃশির ত্রিভুজ—এক ভুজ সত্ব, এক ভুজ রজ, আর এক ভুজ তমগুণ।

সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল এই—সুষুপ্তিকালে ঈশ্বরের মনে কোন এক ভাবের উদয় হইলে তিনি জাগরিত হন, আর অমনই সেই ভাব-জ্যোতি দৈবী-প্রকৃতি-বলে ঈশ্বর হইতে মূলাপ্রকৃতিতে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তৎপরে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। সৃষ্টি-কাণ্ডের দুইটি বিভাগ—Subjective side এবং Objective side. ঈশ্বরের মানসক্ষেত্রে কল্পনার সঞ্চার, এই প্রথম অবস্থা বা পূর্ব্বাভাষ। মূলা-প্রকৃতি-কৃত সৃষ্টিকার্য্য, এই দ্বিতীয় অবস্থা। দৈবীপ্রকৃতির অপর নাম গায়ত্রী; ইহাকে সাবিত্রীও কহে। এই গায়ত্রী বা সাবিত্রী ভগবানের শক্তিরূপ। গায়ত্রীর ক্ষমতা অসীম; শুদ্ধ চিত্তে নিয়ম করিয়া এই গায়ত্রী জপ করিলে জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়। সৃষ্টির প্রাক্কালে ঘোর তমস্ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এই তমস্ অজ্ঞানের কারণ। ইহাকে মূলা-প্রকৃতি, মায়া বা অবিদ্যা কহে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি অজ্ঞান, উভয়ই যাবতীয় সৃষ্টপদার্থের উৎপত্তি স্থান ও লয় স্থান। এই অজ্ঞানকে

উপাধি বলে। উপহিত চৈতন্য এই অজ্ঞানের উপশ্ব কার্য্য করিয়া থাকেন। অজ্ঞানের দুটী শক্তি আছে—আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। সূত্রাত্মার ইংরাজি নাম 'Soul. এই সূত্রাত্মা, বিশুদ্ধ-চৈতন্যের বিমল জ্যোতির প্রতিবিম্ব মাত্র। মলিন সত্ব-প্রধান উপাধিতে অধিষ্ঠিত যে জীব-চৈতন্য, তিনিই সূত্রাত্মা। ইনি বদ্ধ ও প্রাজ্ঞং; স্বর্গে বা দেবলোকে সূত্রাত্মার বাস। দেবতাদিগের বাসস্থান বলিয়া স্বর্গকে ত্রিদিব কহে। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি স্বর্গে আছেন। এই ৩৩টী দেব। এবং ঐশি-শক্তি-সম্পন্ন তাঁহাদের অনুচরবর্গ মিলিয়া হিন্দুদের ৩৩ কোটি দেবতা। দেবতাদের মৃত্যু নাই, ইঁহারা অমর। সকলেই প্রজ্ঞাবীজবিশিষ্ট, সকলেরই ব্রহ্মজ্যোতি আছে। দেবতাদেরও দেহ আছে, তাহার নাম কারণ-শরীর। হিরণ্ময় অণ্ডে চৈতন্য-শক্তির আবির্ভাব হইলে কারণ-শরীর গঠিত হয়। দেহ মাত্রই কর্ম্মের ফল, কারণ-দেহও আমাদের কর্ম্মের ফল। কর্ম্ম বলিলে কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বুঝায় না; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যকেও কর্ম্ম বলা যায়। সুতরাং চিন্তা করা একটা কার্য্য। সৎ বিষয়ের চিন্তা, ধর্ম্ম বিষয়ের চিন্তা, পবিত্র ও উচ্চ ভাবের চিন্তা, এ সকলই সৎ কর্ম্ম। কারণ-শরীর বর্দ্ধিত করিতে হইলে আমাদিগকে একাগ্রচিত্ত হইয়া উচ্চ ও পবিত্র ভাবতরঙ্গে মনকে ভাসাইয়া দিতে হইবে। গুরুর উপদেশ এই—অনবরত চিন্তা কর, সারাদিন ভাব, গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হও, ধর্ম্ম অনুশীলন কর, আত্মত্যাগ ও আত্ম-বঞ্চনা অভ্যাস কর, জগতের কার্য্যে প্রাণ, মন, সময় ও অর্থ উৎসর্গ কর, এক কথায়—বিশ্ব-প্রেমের প্রেমিক হও। এই

সকল কার্য্য করিলে কারণ-শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। সূত্রাত্মা এই কারণ-শরীরে বাস করেন। একাগ্রতা না থাকিলে ধ্যান ও সাধনার ব্যাঘাত ঘটে, চিন্তা করা চলে না। চিন্তার শক্তি অপার, শব্দের ক্ষমতা অসীম। শব্দ ও ভাবকে হীনবীর্য্য মনে করিও না। ভাব ও শব্দ মৃত নহে, সজীব; অচেতন নহে সচেতন। মন্ত্র, শব্দের গাঁথনি, বাক্যের যোজনা মাত্র। সেই মন্ত্রের কত প্রভাব? চিন্তার অতুল প্রভব জানিবে। বিশ্বসৃষ্টি চিন্তা বলে; জগতের প্রলয়ও চিন্তা বলে সংঘটিত। এই অনন্ত আকাশে চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছে, ভাবের বীজ ভাসিতেছে, শব্দের কণা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সেই সকল ভাব-বীজ মানবের মনের উপর কার্য্য করে। উৎকৃষ্ট দ্রব্য সমুদয়ের সার-সংগ্রহ লইয়া কারণ-শরীর গঠিত। Personal consciousness ক্রমে পরিশুদ্ধি লাভ করিয়া Individual consciousness এ পরিণত হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ-শরীরকে তুলনায় সমালোচন করিলে বলিবে, প্রথমটী গোলাপ ফুল, দ্বিতীয়টী গোলাপ জল ও তৃতীয়টী গোলাপী আতর; অথবা দুগ্ধ, তক্র ও নবনীত। ননী ভাল বাসিতেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ননীচোর। চৈতন্য-শক্তি, ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে গমন করে; স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে কারণ-শরীরে যায়। যাইবার সময়, কারণের উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। মধুমক্ষিকাগণও মলয় হিল্লোলে অঙ্গ ঢালিয়া বন হইতে বনান্তরে গমন করে এবং চক্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য পুষ্পাদিকুসুমের দলগত মধু সঞ্চয় করিয়া চলিয়া যায়। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি। মৃত্যুর পর স্থূল দেহ মাটিতে পড়িয়া থাকে। সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ (আতিবাহিক দেহ)

স্থূল-দেহ হইতে বাহির হইয়া পিতৃলোকে বিচরণ করে। ভূত-যোনির যাতনা-দেহ। পুণ্যাত্মারা শীঘ্রই এই যাতনা-দেহ ত্যাগ করিলে পর কেবল মাত্র কারণ-দেহে দেবলোকে চলিয়া যান। সকলেই জানেন, অগ্রে পুন্নাম, শেষে স্বর্লোক; আগে কষ্ট, পরে সুখ। পাপাত্মারা বহুকাল ধরিয়া আতিবাহিক দেহে নরকে পচিয়া মরে এবং কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়। যে সকল লোকের বাসনা তৃপ্ত হয় নাই, তাহারা বার বার ইহসংসারে ঘুরিয়া আসিবার চেষ্টা করে। কেহ কেহ আপন মৃতদেহে পুনঃ প্রবেশ করে। অতৃপ্তকাম ভূতযোনি হইতে আমাদের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ইহাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা।

স্থূল-দেহের উপাদান—ইন্দ্রিয়, মন, সূত্রাত্মা (মলিন উপাধি)।

সূক্ষ্ম-দেহের উপাদান—ইন্দ্রিয়, মন, সূত্রাত্মা (সামান্য উজ্জ্বল উপাধি), বাসনা, কামনা।

কারণ-দেহের উপাদান—সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন, সূত্রাত্মা (উজ্জ্বল বিমল উপাধি),বাসনা, কামনা।

ভূ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোক। এই তিন লোকে জীবের গতিবিধি। কারণ শরীরে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিলে, জীব তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। তখন দৈবী শক্তির পূর্ণজ্যোতি জীবে অবভাসিত হয়, তাঁহার প্রজ্ঞা অধিযজ্ঞে উন্নীত হয়। তখন জীব জীবন্মুক্ত হয়েন, সংসারে আর তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু বিশ্বপ্রেমে মুগ্ধ, উদারচেতা কোন কোন মহাত্মা জীবন্মুক্ত হইয়াও, জীবের দুঃখ-ভার বহন করিবার নিমিত্ত, অজ্ঞানান্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য, ইচ্ছা পূর্ব্বক পুনরায় এই কর্ম্মক্ষেত্রে

সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। ধন্য, মা বসুমতি! হে মহাভাগ মহাপুরুষ! তুমিও ধন্য।

প্রণব = ওঁ = অকার + মকার + অর্দ্ধমাত্রা।

পরব্রহ্ম (ঁ)
|
ঈশ্বর (ম)
|
গায়ত্রী (উ)
|
মায়া (অ)

পরাকলা		দৈবীপ্রকৃতি মূলাপ্রকৃতি	—————— ঁ (অর্দ্ধমাত্রা)
পশ্যন্তী	শক্তি	কারণশরীর সূত্রাত্মা	স্বঃ—————ম কার
মধ্যমা	বিন্দু	সূক্ষ্মশরীর হিরণ্যগর্ভ	ভুবঃ————উ কার
বৈখরী	নাদ	স্থূলশরীর বৈশ্বানর	ভূঃ—————অ কার

———o———

কর্ম্মযোগ।

(৯)
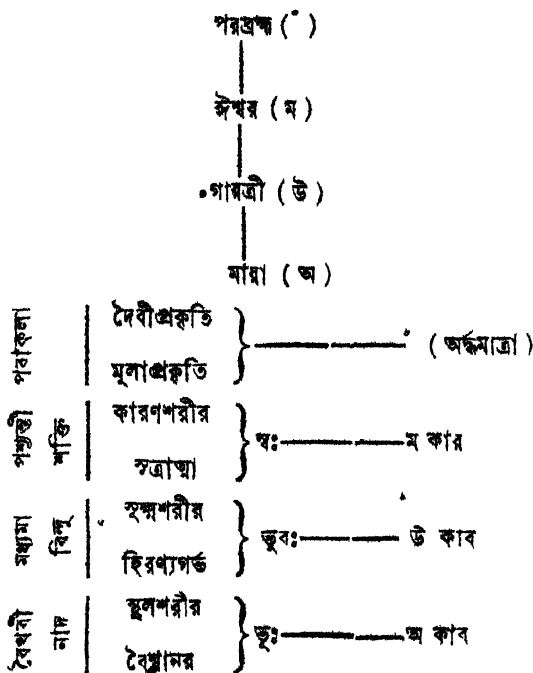
১। কর্ত্তা কে?—সত্ত্বরজস্তমগুণাত্মক প্রকৃতি। যিনি কর্ত্তা তাঁহারই ত দায়; সুতরাং প্রকৃতিই দায়ী। বুঝিলাম দায়িত্ব ও

কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির। প্রকৃতির সহিত মন জড়িত এবং মনের সহিত শরীরের নিকট সম্বন্ধ, এ কথা বেন্ ও স্পেন্সার প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। সুতরাং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সহিত যাহার যাহার সম্পর্ক আছে, তাহাদের সকলকেই প্রকৃতির দায়ে দায়ী হইতে হয়। ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতির অবলম্বন; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, দেহক্ষেত্রে প্রকৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। সৎ বা অসৎ কর্ম্ম, পাপ বা পুণ্য-সঞ্চয়, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম,—কায়মনোবাক্যে সংসাধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির কৃত কোন দোষ বা অপরাধ বিবেকের বিচারে সপ্রমাণিত হইলে, প্রকৃতিকে একা দণ্ড পাইতে হয় এমন নহে, প্রকৃতিগত মন ও শরীরকেও সে ভোগ ভুগিতে হয়। এখন জানা গেল, দায়িত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও ভোগ প্রকৃতির যেরূপ, মন ও শরীরেরও সেইরূপ, এড়ান বা অব্যাহতি কাহারও নাই।

২। কর্ম্ম কি?—যদ্দ্বারা জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হয়, তাহার নাম কর্ম্ম। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দেহে কার্য্য করিয়া থাকে। দেহস্থ স্নায়ুগুলি সকল কার্য্যের সাধন। এই স্নায়ু-বলে মাংসপেশী-গুলি শারীরিক কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মনও কার্য্য করে। কার্য্য দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। চলা ফেরা যেমন কার্য্যের মধ্যে গণ্য, চিন্তা করাও সেইরূপ কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। চিন্তার অপার শক্তির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চিন্তার এমনই প্রভাব যে, ইহা দ্বারা ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই সংঘটিত হইতে পারে।

৩। কর্ম্মের বীজ কোথা? Will, Volition ও Motive, এগুলি [illegible]। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে কর্ম্ম-বীজ নিহিত;

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরে কর্ম্মবীজ থাকে। প্রধানতঃ, বাসনা ও কামনাকে কর্ম্মের বীজ বলিয়া বলিতে হয়, যেহেতু বাসনা ও কামনার নাশ না হইলে কর্ম্মের নাশ হয় না। তথা, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির নাশ না হইলে, কর্ম্মের নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মানুরাগ যত দোষাবহ, কর্ম্ম তত দোষাবহ নহে। আসক্তি-লতাকে উচ্ছেদ করা আমাদের সর্ব্ব-বিধায় কর্ত্তব্য। আসক্তিকে ছিন্ন করিয়া কর্ম্ম করিলে কোন আশঙ্কা নাই, অপকার নাই, বরং উপকারই হইয়া থাকে।

৪। কর্ম্মের প্রয়োজন কি? কর্ম্ম করিলেই যদি সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর জন্মিলেই যদি অশেষ কষ্ট পাইতে হয়, তবে যাহাতে পুনর্জ্জন্ম না হয়, তাহার চেষ্টা করি না কেন? অতএব কর্ম্ম না করাই ত ভাল?

কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কর্ম্ম করিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় সত্য; জন্মিলেই কষ্ট পাইতে হয়, ইহাও সত্য; তথাপি কর্ম্ম করা চাই। কর্ম্ম না করিলে এক দণ্ড যে চলে না—কর্ম্ম ব্যতীত যে প্রাণরক্ষা বা প্রাণধারণ দুষ্কর। খেতে, শুতে, যেতে—কর্ম্ম। চলা, ফেরা, বসা, দাঁড়ান সকলই ত কর্ম্ম। সর্ব্বশরীরে রক্ত সঞ্চালন হইতেছে, ফুসফুস্ যন্ত্রে ক্রিয়া হইতেছে। রক্তের চলাচল বন্ধ হইলে, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে, তুমি এক দণ্ড বাঁচিবে না; সুতরাং কর্ম্ম আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। গীতায় আছে:—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তেন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

অস্যার্থঃ। হে অর্জ্জুন! তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর, অর্থাৎ বেদোক্ত

যজ্ঞাদি, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান কর। কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে এমন কি তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।

গীতার আর এক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষলোকেষু কিঞ্চন।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি॥

অস্যার্থ। দেখ অর্জ্জুন! ত্রিভুবনের মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মানুষ্ঠান লোক-শিক্ষার তরে, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত। ভগবান্ স্বয়ং, ফলকামীও নহেন, ফলভোগীও নহেন। ফলকামনা করিলেই ফলভোগ করিতে হয়, কিন্তু কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, কাহাকেও ফলভোগ করিতে হয় না।

৫। কর্ম্মের প্রকার ও কর্ম্ম-বিভাগ :—

কর্ম্ম, অকর্ম্ম (কর্ম্ম পরিত্যাগ), নিষিদ্ধ কর্ম্ম, এই তিনের ভিতর কেবল কর্ম্ম-বিভাগের কথা বলিতেছি। কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—কাম্যকর্ম্ম ও নিষ্কামকর্ম্ম। স্বর্গপ্রাপ্তির আশয়ে বা সুখের কামনাতে যে সমুদয় কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে কাম্যকর্ম্ম বলে, যথা—রাজসূয় যজ্ঞ, দুর্গোৎসব, সোমযাগ। ফলকামনা রহিত হইয়া, যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে নিষ্কামকর্ম্ম বলে। কর্ম্ম-ফল নারায়ণে অর্পণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। নিঃস্বার্থ-ভাবে জগতের মঙ্গলের জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে নিষ্কাম-কর্ম্ম কহে। বেদে কাম্যকর্ম্মের ব্যবস্থা; গীতায় নিষ্কামকর্ম্মের উপদেশ। কাম্যকর্ম্মের ফলে (Spiritual plane) বা স্বর্গ পর্য্যন্ত

যাওয়া রহিত হইতে পারে; স্বর্গে আর যাওয়া যায় না। এই গেল কাম্যকর্ম্মীর কথা। আর যিনি নিষ্কামকর্ম্মী, তিনি মনে করিলে (Neutral barrier) অতিক্রম করিয়া স্বর্গের উপরে গোলক-ধাম বৈকুণ্ঠপুরীতে গমন করিতে পারেন।

বিচার স্থলে বলিতে হয়, অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম ভাল; সকাম অপেক্ষা নিষ্কামকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

প্রধান কাম্যকর্ম্মের ভিতরে অনেক খণ্ডকাম্যকর্ম্ম আছে, যথা— নিত্যকর্ম্ম (সন্ধ্যাবন্দনা), নৈমিত্তিক কর্ম্ম (পুত্রেষ্টিযাগ), প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা।

পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রে সৎকর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা আছে ও তদনুষ্ঠানের উপদেশও আছে, আবার অপকর্ম্মের নিষেধ ও আছে।

উক্ত শাস্ত্রে পঞ্চ যজ্ঞের কথা লিখিত আছে, যথা—দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। এ সম্বন্ধে পরে বলিব।

৬। কর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা ও তদনুশীলন :—

ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে হইবে। পরে মল-মূত্রত্যাগ করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিবে। মুখপ্রক্ষালনে তোমার বাক্‌যন্ত্র পরিষ্কৃত হইবে; পরিষ্কার থাকিলে ঐ যন্ত্র তোমার ইচ্ছার বশে থাকিয়া চলিবে। জিহ্বাকে যখন আদেশ করিবে—"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং", জিহ্বা তদণ্ডে তোমার আদেশ পালন করিবে। পূতিগন্ধ নিরাকরণ করা প্রক্ষালনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ববশে আনা উহার অন্যতম লক্ষ্য। তাহার পর স্নানের ব্যবস্থা। অবগাহনে অধিক তৃপ্তি জন্মে। স্নান করিবার সময় মনে করিবে, বিষ্ণুপদস্রাবী অমল পুণ্য-সলিলা ভাগিরথীর নির্ম্মল ও পবিত্র জলে তোমার দেহের ও মনের মল-

রাশি নিধৌত হইল। কথায় বলে যে, Cleanliness is next to godliness." অবগাহনে তোমার দেহ ও মন পবিত্র হইল। স্নানান্তে পূত পট্টবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিবে ও বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিবে। এ সময়ে, অশুচি ও অস্নাত কোন লোক যেন তোমাকে স্পর্শ না করে; তুমিও কোন অপবিত্র সামগ্রী স্পর্শ করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই, সংসারের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার দ্বারা সংযত করিতে হইবে, অর্থাৎ বহির্মুখী জ্ঞানকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে৭ তৎপরে নির্জ্জন পূজা গৃহে গিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। দেবযজ্ঞে দেবগণের পূজা; পিতৃযজ্ঞে তর্পণ, শ্রাদ্ধাদি; ব্রহ্মযজ্ঞে বেদাধ্যয়ন; নৃযজ্ঞে অতিথি সৎকার; এবং ভূতযজ্ঞে, কীটপতঙ্গকে আহার দান। এই সকল সৎকার্য্য করিবে। তপশ্চরণ ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না, এ জন্য তপশ্চরণ করিবে। গুরু, ব্রাহ্মণ দেবতাদের পূজা করিবে ও সকলের নিকট প্রণত হইবে।

তুমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী। জগতের উপকার করিবে বলিয়াই ভগবান্ তোমায় এতটা সম্পদ দিয়াছেন। অতএব তুমি অকাতরে দীন দুঃখীকে অর্থদান করিবে। তাহা হইলে অর্থেরও সার্থকতা হয়, আর তোমার দুর্লভ মানব জন্মও সফল হয়। দান নানা প্রকারের আছে—অর্থদান, বস্ত্রদান, অন্নদান, ভূমিদান, গোদান, বিদ্যাদান ইত্যাদি। সকল প্রকার দানই প্রশস্ত ও অনুষ্ঠানযোগ্য। হীনাবস্থা প্রযুক্ত হয় ত কেহ দান করিতে পারিল না। কার্য্যতঃ দানে অক্ষম হইল বটে, কিন্তু যদি তাহার মনেতে দান করিবার ইচ্ছা উদয় হয়, তবে সেই সাধু ইচ্ছা কার্য্যের সমান ফলোপধায়ী হইয়া থাকে।

দানের পর আহারের কথা। আহারটা সাত্ত্বিক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সাত্ত্বিক আহারে দেহে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় ও লাবণ্য আনে। জীবহিংসা ভাল নহে। মৎস্য-মাংস ভোজনে তোমার রসনার কথঞ্চিৎ তৃপ্তিসাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু এক বার ভাবিয়া দেখ, তোমার ক্ষণিক সুখের তরে একটা জীবের প্রাণনাশ হইল।

সচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকংমহৎ॥

পোড়া পেটের দায়ে মহাপাতক করা কেন? অতএব মৎস্য মাংস পরিবর্জ্জন করিতে পারিলেই মঙ্গল। আহারের সময় একবার স্মরণ করিও, অনেক গরীব লোক অভুক্ত রহিয়াছে, আর তুমি উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আহার করিতেছ। উদ্দেশে সেই অভুক্ত ব্যক্তিদিগকে আপন খাদ্যের কিয়দংশ বন্টন করিয়া দেও। এরূপ সাধু চিন্তাতেও অনেক ফল আছে।

বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হও, জগতকে আপন পুত্রকন্যার ন্যায় ভাল বাসিতে শিখ। বৃদ্ধ মাতা-পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র কন্যা, দাস, দাসী এই সকল লইয়া ত তোমার পরিবার। তুমি ইহাদের প্রতিপালক। ভগবান্ সর্ব্ব জীবে আহার যোগাইতেছেন, তুমি নিমিত্ত মাত্র। ভগবান্ জগৎপাতা, জগতের পালন তাঁহারই কার্য্য। তবে তিনি স্বহস্তে কিছু করেন না, তুমি আমি আমরা উপলক্ষ স্বরূপ হইয়াছি। সেই রাজরাজেশ্বর কেমন সুন্দর নিয়ম প্রজাপালন করিতেছেন দেখ। নিয়ম একবার বাঁধিয়া দিয়াছেন, আর এই বিশ্বসংসার সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

বাসনা হইতে কর্ম্ম (হোম, যজ্ঞ), হোমের ধূম আকাশে উঠিয়া মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়; বৃষ্টি হইতে ক্ষেত্রে শস্য হয়। শস্যে অন্ন; অন্নে শরীর পোষণ হয়। এ সমস্ত ব্যাপার দেবতাদের ক্ষমতার অধীনে। অতএব দেবতাদিগকে তুষ্ট রাখিতে পারিলে জীবের মঙ্গল। জগতের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থকে বলি দিতে হয়। স্বার্থত্যাগী না হইলে জগতের উপকার করা যায় না। যে সকল যোগী আত্মসংযমী হইয়াছেন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতাঃ। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, রেতঃক্ষয়ে পদস্খলন হয়, আত্মার মলিনতা জন্মে। রেতঃপাতন মহাপাপ। প্রাণপণে যোগীরা এই ব্রত পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন এই ব্রতধারী ঊর্দ্ধরেতাঃ যতিগণ জানিতে পারেন যে, কোন মহাত্মা জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত, সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে উদ্যত, তখন তাঁহারা জগতের মঙ্গলের জন্য এতকাল সযত্নপালিত মহাব্রত ভঙ্গ করেন। তাহাতে তাঁহাদের পদস্খলন হয়, আত্মার মলিনতা জন্মে। এ মহা ক্ষতি তাঁহারা স্বীকার করেন। এই সন্তানোৎপাদন ক্রিয়া প্রসঙ্গে যাহা বলা হইল, তাহার দৃষ্টান্ত পরাশর। সত্যবতীর গর্ভে ও পরাশরের ঔরসে ব্যাসের জন্ম হয়। সে অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত মহাভারতের সকল পাঠকই অবগত আছেন। আত্মসংযমী ঊর্দ্ধরেতাঃ পরাশর পরমপদ লাভের আশায় ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি কামাসক্ত ছিলেন না। সত্যবতীর রূপযৌবন ঋষির নিকট অতি ছারপদার্থ। পরমপদের কাছে ইন্দ্রিয় সেবা অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। জগতের হিতের নিমিত্ত ব্যাস

সংসারে আসিতেছেন জানিয়া, পরাশর সঞ্চিত তেজঃক্ষয় করিয়া আত্মার মলিনতা স্বীকার করিলেন। তাহাতে তাঁহার পদস্খলন হইল, মহাব্রত ভঙ্গ হইল। এ ক্ষতি তিনি স্বীকার করিলেন; কারণ তিনি বুঝিলেন যে, ইহাতে তাঁহার নিজের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু জগতের ত মঙ্গল হইল। এ কথা আমরা ভাবি না, ভাবিতেও পারি না, কারণ আমরা স্বার্থের দাস, পাপ-শৃঙ্খলে বদ্ধ। ভাবি না ও ভাবিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট। যিনি এ কথা—এ উদার কথা ভাবেন ও ভাবিতে পারেন, তিনি ত দেবতা। তিনি স্বার্থের দাস নহেন, পাপ-শৃঙ্খলেও বদ্ধ নহেন। আমরা মানব, আমরা কেবল নিজের কথা ভাবি ও নিজের জন্য কাঁদি। আর যিনি পরের কথা ভাবেন, পরের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তিনি ত সাক্ষাৎ দেবতা; তাঁহাকে কোটি কোটি নমস্কার।

জ্ঞানযোগ।

(১০)

জ্ঞান কি?—ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম কে?—যাঁহা হইতে জীবের উদ্ভব, যিনি জীবকে পালন করেন, যাঁহাতে জীব লীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। দেহ ক্ষেত্র; ঈশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞ। কেবল মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন যথেষ্ট নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

জ্ঞানী কে?—ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার অধিকারী কে?—যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার অধি-

কারী। যিনি অধিকারী, তাঁহার দম, দান ও দয়া এই গুণত্রয় আছে। মানসিক অবসাদ ব্যতীত একাগ্রতা আইসে না। ষড়রিপুর সহিত সংগ্রাম, কামনার সহিত বিরোধ, মানসিক অবসাদ আনয়ন করে। এ সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইবে, শত্রুকুল নির্মূল করিতে হইবে, তবে বাসনার দমন হইবে। আত্মীয় স্বজনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে জানিয়া, অর্জ্জুন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; তাঁহার মুখ বিশুষ্ক হইয়া গেল। তখন জ্ঞানোপদেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অবসাদ দূর করিলেন। অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই অর্জ্জুন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। যাহারা ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার প্রয়াসী, তাহাদের সকলকে অর্জ্জুনের ন্যায় অবসন্ন হইতে হইবে। তুমি যদি একাগ্রচিত্ত হইতে পার তবে ব্রহ্মোপদেশ পাইবে, নচেৎ নহে। অবসাদের অপর কারণ থাকিতে পারে। পুস্তকপাঠে অবসাদ উপস্থিত হয়, স্ত্রীলোকের প্রসবকালেও অবসাদ আইসে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, অর্জ্জুন! তুমি বড় ভাগ্যবান পুরুষ, যেহেতু তুমি এই বিপদে পড়িয়াছ। এই সংগ্রাম-সুযোগ যাহার ভাগ্যে ঘটিবে, তাহার মঙ্গল হইবে জানিও—

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে—শ্রীরামচন্দ্রের অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই হেতু তিনি অনেক দিন মৌনী ছিলেন, কাহারও নিকট আপন মনের কথা ভাঙ্গিতেন না। পরে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যখন বশিষ্ঠ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বশিষ্ঠের সম্মুখে অন্তরের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন।

বাহিরে পাপকর্ম্ম করা বরং ভাল, তথাপি মনে পাপচিন্তা করা ভাল নহে। যিনি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থী, তিনি যেন কখনও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, দম্ভ বা আত্ম-প্রশংসা না করেন, কারণ আকাঙ্ক্ষা, দম্ভ, আত্মগৌরব অধঃপতনের প্রকৃষ্ট সোপান।

ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার প্রণালী কিরূপ?—ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার সুব্যবস্থা ও সুনিয়ম আছে। অরুণি তাঁহার পিতাকে কহিলেন—"পিতঃ! আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিউন।" অরুণির পিতা কহিলেন—"বৎস! তুমি তপ কর।" "অরুণি পিতার আদেশক্রমে তপ করিতে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল তপ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"পিতঃ! আমি জানিতে পারিয়াছি, ব্রহ্ম কি বস্তু—অন্নই ব্রহ্ম।" পিতা বলিলেন—"না, অন্ন ব্রহ্ম নহে।" পুত্র প্রশ্ন করিলেন—"তবে ব্রহ্ম কি?" পিতা বলিলেন—"পুনরায় তপ কর, ব্রহ্ম কি জানিতে পারিবে।" অরুণি পুনরায় তপ করিতে গেলেন। কিছুকাল তপ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পিতাকে বলিলেন—"পিতঃ! ব্রহ্ম কি আমি জানিতে পারিয়াছি—প্রাণই ব্রহ্ম।" পিতা বলিলেন, "না"। পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে ব্রহ্ম কি?" পিতা কহিলেন—"তপ কর, ব্রহ্ম কি জানিতে পারিবে।" অরুণি পুনরপি তপ করিতে গেলেন, এবং কয়েক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"পিতঃ! তপ দ্বারা জানিয়াছি মনই ব্রহ্ম।" পিতা বলিলেন—"না, মন ব্রহ্ম নহে, যাও পুনরায় তপ কর গে।" অরুণি পুনরায় তপ করিয়া আসিলেন এবং পিতাকে বলিলেন,—"বুদ্ধিই ব্রহ্ম"। তাঁহার পিতা বলিলেন—"না, বুদ্ধি ব্রহ্ম নহে"; পুনরায় তপ কর গে।" অরুণি

পুনরায় তপ করিতে গেলেন এবং কয়েক বৎসর পরে পিতৃ সমক্ষে আসিয়া কহিলেন—"পিতঃ! এবার আমি ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা জানিতে পারিয়াছি।" পিতা জিজ্ঞাসিলেন—"ব্রহ্ম কি?" অরুণি উত্তর করিলেন—"আনন্দই ব্রহ্ম"। তখন তাঁহার পিতা বলিলেন—"অরুণি, এতকাল পরে ব্রহ্ম কি বস্তু, তুমি তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াছ। আনন্দময় হরির নাম ব্রহ্ম।"

পূর্ব্বকালে এইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত ছিল। গুরু সহজে শিষ্যকে গূঢ়তত্ত্ব বলিয়া দিতেন না। শিষ্যের ধৈর্য্যগুণ, অধ্যবসায়, ইন্দ্রিয়সংযম এই সকল পরীক্ষা করিয়া পরিতুষ্ট হইলে, তবে গুরু শিক্ষা দিতেন। আত্ম-নির্ভর আত্মোন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। আপনার বৃত্তিগুলি আপনাকেই অনুশীলন করিতে হইবে; অপরের সাহায্যে সেগুলি মার্জ্জিত করিলে আবার তাহাতে মরিচা ধরিবার সম্ভাবনা।

ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিলে কি ফল পাওয়া যায়?—ব্রহ্মবিদ্যা শিখিলে জীব ব্রহ্ম হয়েন। বাঘের ছানা বাঘ হইয়া থাকে, কুকুর বা বিড়াল হয় না। Law of heredity অনুসারে এ কথা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পিতার দোষ-গুণ সন্তানে বর্ত্তে। অনুকূল অবস্থার গুণে শিক্ষার বলে—পিতৃদত্ত জ্ঞানের বা গুণের বীজ অঙ্কুরিত হয়। প্রতিকূল অবস্থাতে পড়িলে, শিক্ষার দোষে সেই জ্ঞান-বীজ নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, যাহা কিছু আমাদের আছে বা আমরা পাইয়াছি, সে সমুদয় নিজ ইষ্টসাধনের তরে পাই নাই, পরের উপকারের জন্য পাইয়াছি। তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ, বেশ কথা। সেই জ্ঞান ও বিদ্যা অকাতরে অপরকে দান কর; তাহা হইলে জ্ঞানের গৌরব বাড়িবে; তোমারও আত্মোন্নতিও হইবে এবং পরের উপকার করাও হইবে।

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে personalityর জ্ঞান থাকে; কিন্তু কারণ শরীরে সে জ্ঞান থাকে না, individualityর জ্ঞান হয়। সার কথা এই যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের personalityর জ্ঞান কারণ-শরীরের individualityর জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ হয়।

অভ্যাস যোগ।

(১১)

এই সংসারে থাকিয়াই হরি সাধন হয়। অর্জ্জুন রাজপুত্র, অর্জ্জুন গৃহী, অর্জ্জুনের স্ত্রীপুত্র ছিল, অর্জ্জুন সন্ন্যাসী ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ গৃহী অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন; যোগ ও ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখাইয়া ছিলেন। অর্জ্জুন এই সংসারে থাকিয়াই হরিভজন, হরিসাধন করিয়াছিলেন। সকল লোকই অর্জ্জুনের ন্যায় সংসারে থাকিয়া হরিভজন, হরিসাধন করিতে পারে। অভ্যাসবলে সকলই সম্ভব। অভ্যাস কি?—অভ্যাস আর কিছুই নহে—আত্মসংযম। কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিয়ের সংযম ও কিয়ৎ পরিমাণে মনঃসংযম চাই। অভ্যাসযোগে মনঃসংযম পূর্ণমাত্রায় আবশ্যক। কিন্তু মনঃসংযমের উপায় কি? মন ত স্বভাবতঃ চঞ্চল, অস্থির; অল্পেতেই মনের বিকার জন্মে। কেমন করিয়া এ অস্থির মনকে বশ করা যায়? মনকে বশ করিবার উপায় অবশ্যই আছে। শরীরের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ আছে, এ কথা সকলেই জানে। মনকে বশ করিতে হইলে, অগ্রে শরীরকে বশ করিতে হইবে। যাহাতে মনের বল ও

ওজস্বিতা বাড়ে, এরূপ কার্য্য করিতে হইবে; আর যাহাতে মানসিক বলের হ্রাস হয়, এরূপ কার্য্য কখনও করিবে না। মনকে দৃঢ় ও সবল করিতে পারিলে, দেহ সম্পূর্ণরূপে মনের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিবে। আত্মসংযমী এই সকল নিয়ম পালন করিবেন; এ সকল নিয়ম পালনেই অভ্যাস যোগের সাধন:—

(১) প্রাতরুত্থান, (২) সাত্ত্বিক আহার, (৩) পাপচিন্তা ও পাপ-কার্য্য পরিবর্জ্জন (৪) চিত্তশুদ্ধি, (৫) শাস্ত্রবিশ্বাস, (৬) গুরুব্রাহ্মণ ও দেবতার প্রতি ভক্তি, (৭) বিগ্রহ সেবা ও অর্চ্চনা, (৮) তপশ্চরণ।

আত্মসংযমের এতই গুণ! অভ্যাস যোগের এতই ক্ষমতা। আত্মসংযমে ব্যাঘাত ঘটিলে বিষময় ফল ফলে। আসক্তি আত্ম-সংযমের অন্তরায়, এবং সকল অনিষ্টের মূল।

গীতাতে লিখিত আছে:—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

আর এক স্থলে আছে:—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

এক পক্ষে মন পরম সখা; অপর পক্ষে, মন বিষম বৈরী। অতএব শিক্ষা প্রণালীর দোষে বা গুণে মনোবিকাশের দোষ-গুণ ঘটিয়া থাকে। সেই শিক্ষা প্রণালীর যাহাতে বিভ্রাট না ঘটে,

তদ্বিষয়ে সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মাতৃগর্ভ হইতেই সেই শিক্ষা-স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে।

দেবভক্তি প্রবল হয় কিসে?—স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া বিশুদ্ধ মনে ভগবান্‌কে ডাকিবে। দেবার্চ্চনার নিমিত্ত একটী নির্জ্জন ঠাকুরঘরের আবশ্যক। সেই ঘরে গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা একটী ক্ষুদ্র বেদী নির্ম্মাণ করিবে। উক্ত বেদী গোময় দ্বারা মার্জ্জিত করিবে, পরে গঙ্গাজল দিয়া পরিষ্কার করিবে। অশুচি অবস্থাতে কেহ যেন সে গৃহে প্রবেশ না করে। সে ঘরের বায়ু নির্ম্মল, পবিত্র। সে বায়ুমণ্ডল তাড়িৎময়—তোমার দেবসেবায় উপযোগী। অশুচি অবস্থাতে কেহ সে গৃহে প্রবেশ করিলে, গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হইবে। তাড়িৎগর্ভবায়ুমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া, একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে বসিবে। এইরূপ করিলে তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ধূপ, ধুনা, তুলসী, চন্দন ও নানা পুষ্পের সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইবে। তখন তোমার মনও ভগবৎ ভক্তিতে নাচিতে থাকিবে। দেবতারা সূক্ষ্ম-শরীরে তোমার পূজার গৃহে অধিষ্ঠান করিবেন, এবং তোমার মনোমধ্যে দেবভক্তি, গুরুভক্তি, বিশ্বপ্রীতির প্রবাহ ঢালিয়া দিবেন। বিগ্রহ-পূজা, মনঃসংযমের একটী প্রকৃষ্ট উপায়।

মনকে সংযত করিবার নিমিত্ত ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

১। মনঃসংযমের অস্বাভাবিক নিয়ম—হটযোগ। কুণ্ডলিনী-শক্তি দুইটী—একটী ঊর্দ্ধ কুণ্ডলিনী, অপরটী অধঃ-কুণ্ডলিনী। ঊর্দ্ধ কুণ্ডলিনীর নাম দৈবীপ্রকৃতি। ইনি সহস্রারে বিরাজ করিতেছেন। আর অধঃ-কুণ্ডলিনী Sacral Plexus নামক মূলাধার

চক্রে বিরাজ করিতেছেন। কুণ্ডলিনী, সর্পের নাম। ইহা আ৽. বার পাক দিয়া কুণ্ডলী হইয়া আছে। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, কুণ্ডলিনী প্রণব=ওঁ। অধঃ-কুণ্ডলিনী মূলাধার-চক্রে ঘুমাইয়া আছেন। হটযোগী প্রাণায়াম দ্বারা এই নিদ্রিত সর্পকে জাগরিত করেন। জাগরিত হইলে সেই কুণ্ডলিনী সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। শেষে ব্রহ্মরন্ধ্রে আসিয়া ঊর্দ্ধ কুণ্ডলিনীর সহিত মিলিত হয়। হটযোগী বলেন, আমাদের মন, প্রাণবায়ু দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। অতএব প্রাণের অনুশাসনে মনের অনুশাসন হইয়া থাকে। হটযোগের দ্বারা প্রাণবায়ুর অনুশাসন হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা মনও অনুশাসিত হইয়া থাকে। এই হইল, প্রাণায়ামের উপকারিতা, আর এই উপকারিতা আছে বলিয়াই প্রাণায়ামের প্রয়োজন। হটযোগে যে কিছুই ফল পাওয়া যায় না, এ কথা বলি না। ইহাতে কতকগুলি সূক্ষ্মশক্তির তেজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইংরাজীতে সেই শক্তিগুলিকে বলে Psycho-magnetic powers; কিন্তু এ পথে বড় বিপদের আশঙ্কা আছে। যোগীকে পতনে পাইলেই কুণ্ডলিনী দংশন করিয়া থাকে। হটযোগীর শত্রু অনেক। যে সকল ক্ষুদ্রযোনি অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছে, তাহারা যোগীকে নানা বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে ও অশেষ প্রকারে যোগের বিঘ্ন করিবার চেষ্টা করে। তাহার কারণ যোগী তৈজস-শক্তি লাভ করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যাতে পারগ না হইয়া হটযোগ করিলে বিশেষ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখিলে পর সে বিপদের আর ভয় থাকে না। তাহার কারণ, তখন গুরুদেব তাহার সহায়, দৈবী-

শক্তি তাহার রক্ষক। ভূতযোনি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

২। আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাঁহারা বলেন অঙ্গুলি দ্বারা শ্রবণপথ রুদ্ধ করিলে রাধাশ্যামের মুরলীধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়! চক্ষু মুদ্রিত করিলে খেচরী মুদ্রা আজ্ঞাচক্রে সেই শ্রীহরির জগন্মোহন রূপ দর্শন করা যাইতে পারে। ইহাদের শাস্ত্রে নাদ ও বিন্দুর অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়। ইহাঁরা বলেন, অল্প দিন অভ্যাস করিলেই আমাদের ভাগ্যে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে। ভ্রূযুগলের সন্ধিস্থলে আজ্ঞাচক্র আছে। চক্ষু মুদিয়া ঐ চক্রের দিকে লক্ষ্য করিলে আলোকের গোলাকৃতি দেখা যায়। এ কথা সত্য। সকলেই ইহা অনুভব করিয়া থাকেন। কর্ণ-বিবর রুদ্ধ করিলে এক প্রকার শোঁ শোঁ শব্দও শ্রুতিগোচর হয় বটে, কিন্তু শঙ্খ ঘণ্টা বা কাঁসরের শব্দ শুনা যায় না।

হটযোগের অপকারিতা।

আমাদের দেহের ভিতরে যে ষট্চক্র আছে, সেগুলিকে Plexus বলে। সেগুলি কমল-কোরক; নতশির হইয়া আছে। কাল পূর্ণ হইলে, জ্ঞান-রবি উদিত হইলে, নতশির কমল-কোরকগুলি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া রবির জ্যোতিতে বিকসিত হইতে থাকিবে। বলপূর্ব্বক কুঁড়িকে ফুটাইবার চেষ্টা করিলে, পাপড়ীগুলি ঝরিয়া পড়ে, কুঁড়িটাও শুকাইয়া যায়। ব্যস্ত হইলে চলিবে না, তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নহে। প্রাণায়াম বা অপর অস্বাভাবিক যোগপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তোমার অস্ফুট কোরক সদৃশ চক্রগুলিকে প্রস্ফুটিত করিতে গিয়া, দেখিও, যেন একবারে নষ্ট করিয়া ফেলিও না। তোমার বুদ্ধির দোষে যদি কোন চক্র নষ্ট করিয়া

ফেল, জানিও, এ জনমের মত সে চক্র নষ্ট হইয়া গেল। নষ্ট হইলে পর, তোমাকে আর এক জনমের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। পরজন্মে নবজীবন লাভ করিয়া নূতন শরীরে নূতন চক্রে, তোমাকে সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে। তুমি সাধনা করিতে পার বটে, কিন্তু সিদ্ধি ভগবানের হাতে। সিদ্ধি দূরের কথা। নবজীবন হইলেই অক্ষয় ফল লাভ হয় না; সাধনা করিলেই সিদ্ধি হয় না। আপনা আপনি ও কাজ হয় না। ও কাজ করিতে গেলে গুরুর সাহায্য আবশ্যক। গুরু সহায় না থাকিলে একাও কাজে হস্তক্ষেপ করিও না; যদি কর, বিপদে পড়িবে। স্মরণ হয় কি?—এক দিন সকল ধেনু মিলিয়া কালিন্দীকূলে কালীয়হ্রদে জলপান করিতে গিয়াছিল। সেদিন রাখাল-রাজ গোপাল তাহাদের সঙ্গে ছিলেন না। মনে হয় কি?—সেই বিষাক্ত বারি পান করিয়া শোভন-দৃশ্য শ্যামলীধবলীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল।

কথাটা রূপক বটে। রূপকের ব্যাখ্যা এইরূপ—এখানে জীবকেই ধেনু বলা হইয়াছে। যমুনা অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান। কালীয়= কুণ্ডলিনী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপাল।

তাৎপর্য্য এই, জগৎগুরু ভগবান্ নারায়ণ, সহায় না হইলে জীবের উদ্ধার হইবে না। জীব একা অর্থাৎ গুরুর সাহায্য ব্যতীত মুক্ত হইবার চেষ্টা কখনও করিবে না। যদি চেষ্টা করে, সে চেষ্টা বিফল হইবে, শেষে মারা যাইবে। অতএব ভগবান্‌কে ডাক, ভাই; তিনি তোমার সহায় হইবেন। তিনি সহায় হইলে তোমার কোন ভয় বা ভাবনা থাকিবে না। ব্যস্ত হইও না— জোরে কুঁড়িকে ফুটাইবার চেষ্টা করিও না, কুঁড়ি নষ্ট হইবে। মন্ত্র

না শিখিলে নিদ্রিত কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে যাইও না, কুণ্ডলিনী দংশন করিবে। তুমি বিষের জ্বালাতে ছট্‌ফট্‌ করিবে, অবশেষে প্রাণ হারাইবে।

ভক্তিযোগ।

(১২)

দিব্যচক্ষে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। সে ঘোরা রূপ দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। ভয়-চকিত হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "প্রভো! এ দাসকে একবার অঘোরা মূর্ত্তি দেখাও।" ভক্তের ভগবান্ শ্রীহরি, শান্তমূর্ত্তিতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে দেখা দিলেন। অর্জ্জুন চরিতার্থ হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন! আজ তুমি আমার যে মূর্ত্তি দর্শন করিলে, দেবতাদের ভাগ্যেও সে মূর্ত্তি দর্শন ঘটে না। তোমার একান্ত ভক্তি আছে বলিয়াই তুমি আজ আমার দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তির দর্শন পাইলে। ভক্তির এমনি শক্তি, এমনই মাহাত্ম্য জানিবে।" কর্ম্মযোগে বলিয়াছি, মনঃসংযম কতক পরিমাণে আবশ্যক, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ণমাত্রায় চাই। অভ্যাস যোগে বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত পূর্ণমাত্রায় মনঃসংযম আবশ্যক। জ্ঞানযোগের প্রধান লক্ষ্য, বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ। ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি—অর্থাৎ যিনি ভক্তিমার্গের পথিক, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য—কিসে কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্যের

আলোক তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়; তাঁহার অন্তরের অন্তরে যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়াছে, কিসে তাহার দীপ্তি প্রখর ও উজ্জ্বল হয়। কেহ কেহ কখন কখন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—"ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়?" ভক্তের উত্তর—ভক্তিই বড়। তাই ভক্তের চক্ষে মহাভারত, বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; গীতা, উপনিষদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ভাগবৎ, দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্ত দিব্য-দর্শন ও দিব্য-শ্রবণ লাভ করিতে সমর্থ হন। ভক্তিভরে ভক্ত যখন ভগবান্‌কে ভাবেন, ভগবান তখন স্থির থাকিতে পারেন না—তাঁহার আসন টলে, তিনি ভক্তকে দর্শন দেন, ভক্তের সহিত কথা কহেন। তবে কি তাঁহার ভাষা আছে? ভাষা আছে বৈ কি? এখন সেই দেবভাষা ও মন্ত্রতত্ত্বের কথা বলিতেছি।

পরব্রহ্ম, পরাকলার অতীত। পরা=ভাষা; কলা=শব্দ; কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম, পরাকলার অতীত নহেন। ভাষা কি? ভাষার উৎপত্তি কোথা হইতে? ভাষাতত্ত্ব, বেদের অঙ্গ। মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত, প্রাণ ও অপান বায়ুর মধ্যে একটী শক্তি-প্রবাহ ছুটিতেছে। সেই শক্তি-প্রবাহ হইতে শব্দ ও বাণী সমুত্থিত হইতেছে। যাহারা স্থূলশরীরধারী, তাহাদের ভাষার নাম "বৈখরী" এবং শব্দের নাম "নাদ"। Physical plane বা ভূর্লোককে Hall of Ignorance কহে। সূক্ষ্ম শরীরীদের ভাষার নাম "মধ্যমা," এবং শব্দের নাম "বিন্দু"। Astral plane বা ভুবর্লোককে Hall of Learning কহে। যাহারা কারণ-শরীরধারী তাহাদের ভাষার নাম "পশ্যন্তী" এবং শব্দের নাম "শক্তি"। Spiritual plane বা স্বর্লোককে

Hall of Wisdom কহে। দেবীপ্রকৃতির যে ভাষা, তাঁহাকে "পরা" কহে, এবং যে শব্দ তাঁহাকে "কলা" বলে। ভূর্লোকের শব্দ ও ভাষা আমরা জানি ও ব্যবহার করিয়া থাকি। ভুবর্লোকে পিতৃগণ বাস করিয়া থাকেন। দীক্ষিত সন্ন্যাসীগণ "মধ্যমা" ভাষাতে দেবতাদের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহাদের নাম "বিন্দু" (Astral light) অর্থাৎ তাঁহাদের শব্দ বর্ণাত্মক। আমাদের ভাষা শব্দ-মূলক; কিন্তু দেব-ভাষা বর্ণমূলক। আমরা যে কয়টী শব্দ স্পষ্ট-রূপে শুনিতে পাই, তাহার সংখ্যা অতি অল্প। কখন কখন স্পষ্ট শব্দ শুনিতে পাইনা, শব্দের "রেশ্"শুনিতে পাই মাত্র। এই জড় দেহের স্থূল-কর্ণে অনেক শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না; কিন্তু দেবতারা সে সকল অস্ফুট ও অর্দ্ধস্ফুট শব্দ স্পষ্টরূপে শুনিতে পান। শব্দ, বর্ণে; বর্ণ, শব্দে পরিণত হয়। দেবতারা অস্ফুট শব্দের পরিচায়ক বর্ণসমূহ দর্শন করেন। বর্ণমালাতে দেখিবে নানা অক্ষর আছে। এক একটী অক্ষর এক একটী শব্দের চিহ্ন-স্বরূপ এবং এক একটী বর্ণেরও চিহ্ন স্বরূপ। দেবতাদের সহিত কথোপকথন করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ব্যবহার করিবে, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা কারণ-শরীর ধারণ করেন, তাঁহারা দেবতা। ঋষিগণ দেব-ভাষাতে দেবতাদের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন। দেব-ভাষাতে মাতৃকা শক্তি আছে; ইহার ইংরাজি নাম Source of Energy। দৈবী-শক্তির বা ভগবানের যে ভাষা, তাহা উচ্চারিত হয় না। উহা অর্দ্ধমাত্রা বিশেষ "পরকলা"। সকল মন্ত্রেই মাতৃকাশক্তি নিহিত আছে। প্রণবই সকল মন্ত্রের আকর। শব্দ ও বাণীযুক্ত মন্ত্র

শব্দ-বিন্যস্ত বাণী। মন্ত্রবলে সংহার ও সৃষ্টি সংঘটিত হয়। অত-এব জানিবে, মন্ত্রের সংহারিণী ও সৃষ্টিকারিণী শক্তি আছে। ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর অসীম শক্তি। সাবিত্রী মন্ত্রের এক একটী শব্দ এক একটী মূর্ত্তিধারণ করে। কোনটী লাল, কোনটী নীল, কোনটী পীত, কোনটী শুভ্র ইত্যাদি। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ হোমের ইন্ধন প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত অগ্নি যাজ্ঞা করিতেন না। গায়ত্রী উচ্চারণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণের মুখ হইতে ব্রহ্মণ্যদেব শিখাকারে বিনির্গত হইতেন। তাহাতেই হোমাগ্নির স্থাপন হইত।

দেব-ভাষার বিচার শেষ হইল। এখন সগুণ, নির্গুণের বিচার, দোষের হইবে না। ভগবান্ সগুণ না নির্গুণ?

ভগবান সগুণও বটেন এবং নির্গুণও বটেন। মূলাপ্রকৃতির তিনটী গুণ আছে—সত্ব, রজ, তমঃ। ভগবান্ সত্ব, রজ, তমোগুণের অতীত। এই হিসাবে তিনি নির্গুণ। ভগবানের উপাধি সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দ—তিনি সর্ব্বময়, তিনি জ্ঞানময়, তিনি আনন্দময়। ভগবানে সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিন গুণ বিদ্যমান। তিনি সৎ; এই জন্য ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই তাঁহার সমান। সৎ=(অস্ ধাতু) সৎ অর্থে বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বত্র আছেন, সকল সময়ে আছেন, অর্দ্ধমাত্রার ন্যায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। তিনি ত্রিভঙ্গ অর্থাৎ ভূর্ভুবস্ব, এই তিন লোক ক ভাঙ্গিলে অর্থাৎ অতিক্রম করিতে পারিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি গোপাল। জীব মাত্রেই গো, তিনি পালন-কর্ত্তা। তিনি চোর, কারণ তিনি ভক্তের মন চুরী করেন। তিনি হরি, যেহেতু তিনি জগতের পাপতাপ হরণ করেন। তিনি কৃষ্ণ, কারণ তিনি ভক্তকে ত্রিলোকে আকর্ষণ করেন। তাঁহার ১০০০ এক সহস্র

নায়। তিনি এক এবং তিনি সকলের আদিতে। তিনি এক-মাত্র বস্তু, আর ত্রিভুবন অবস্তু অর্থাৎ শূন্য।

তিনি বিশ্বময়। ধ্যানের সময় তাঁহাকে কোথায় খুঁজিব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে? না নিজ-দেহের কোন স্থান বিশেষে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে?

কেহ কেহ বলেন, তিনি দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে থাকেন। যিনি ভক্ত তিনি এ কথার মর্ম্ম বুঝেন। নাভি হইতে দশ আঙ্গুল ঊর্দ্ধে হৃদয় অবস্থিত। সেই হৃদ্‌পদ্মে ভগবান্ অধিষ্ঠান করেন।

এ সম্বন্ধে আর একটী মত আছে। চিবুক হইতে দশ আঙ্গুল ঊর্দ্ধে সহস্রার পদ্ম। ভগবান্ সেই সহস্রারে বিরাজ করেন। জীব যখন মাতৃগর্ভে, তৎকালে দেবতারা জীবদেহের বিভিন্নাংশ অধিকার করেন। ভগবান্ জীবের দক্ষিণ চক্ষু অবলম্বন করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, এবং কখনও ব্রহ্ম-রন্ধ্রে কখনও হৃদয়-কমলে বিরাজ করেন।

ভগবান্ সাকার না নিরাকার?

ভগবান্ সাকারও বটেন, আর নিরাকারও বটেন। তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলে সকল রূপই তিনি ধারণ করিতে পারেন। দৈবী-শক্তিবলে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখা যায়; কিন্তু দিব্য চক্ষু চাই। অচলা ভক্তি থাকিলে দিব্যচক্ষু লাভ হয়। অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বাল গোপাল মূর্ত্তিই অনেক সময়ে দেখা যায়।

উপাসনার ব্যবস্থা কি? সাকারের উপাসনা ভাল. না নিরা-কারের উপাসনা ভাল

নিরাকারের উপাসনা সাধারণ মানব-কল্পনার অতীত। সংসারী

লোকের পক্ষে সাকার উপাসনাই প্রশস্ত। সেই জন্য দেবদেবীর প্রতিমা-সৃষ্টি। সংসারে থাকি, বিষয় কার্য্যে ডুবিয়া থাকি, ছেলে মেয়ে ও টাকা কড়ির কথায় ভগবানকে ভুলিয়া থাকি, পারমার্থিক চিন্তা মনে উদয় হয় না। যদি দিনান্তে একবারও বিগ্রহের মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে পাই, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও ত সংসার ভুলিতে পারি? বিগ্রহ শব্দের অর্থ—যদ্দ্বারা বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করা যায়। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়-চিন্তায় বিচ্ছিন্ন থাকে। তাহাদের একত্রে সংযত করিবার উপায় বিগ্রহ-দর্শন ও বিগ্রহ-সেবা। ইংরাজি Idol শব্দের অর্থ the ideal expressed অর্থাৎ প্রতিমা গঠনের তাৎপর্য্য,—মনের ভাবাদর্শকে স্থূলাকারে ব্যক্ত করা; কল্পনার চরম কীর্ত্তিকে জড়াকারে পরিণত করা, বিগ্রহের উদ্দেশ্য তাহাই। দৈবী-প্রকৃতির আলোকমণ্ডল মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় হরি দেখা দেন। যাঁহারা সাধু, যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাই হরির নব-জলধর-রূপ দেখিতে পান— দেখিতে পান তাঁহার মস্তকে মোহন চূড়া, করে মুরলী। উপাসনা=উপ+অস্ ধাতু অর্থাৎ নিকটে আসা। উপাসনার অর্থ হরির নিকটে আসা। তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে অন্তরের অন্তরে হৃদয় মধ্যে যাইতে হইবে। সেই স্থানে তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। ভক্ত না হইলে তাঁহার পীতাম্বর বঙ্কিম মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায় না, ভক্ত না হইলে তাঁহার সুন্দর মুরলী-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। হরি নিজ মুরলিতে জীবন-সঙ্গীত (Song of Life) গান করেন। যাঁহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ-দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা মহর্ষি, মহাত্মা ও ভক্তিমান্, তাঁহারাই কেবল সেই সঙ্গীত শুনিতে পান। সে সঙ্গীত, পক্ষির অস্ফুট ধ্বনি নহে; সে সঙ্গীতে স্পষ্ট কথা, মিষ্ট ভাষা; সে কথা

অতি মধুর; সে তাহা হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী।" যিনি সে সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। যাঁহার অচলা ভক্তি, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারেন। ভক্তি বলিলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আইসে। ভক্তির উচ্ছ্বাস হইলে হৃদয়-কপাট খুলিয়া যায়। বিশ্বাসই সত্য জ্ঞানের মূল। উপাসকের ও সাধকের জ্ঞান দৃঢ়, ভাব স্থির, বিশ্বাস অটল। মন স্থির না হইলে, ভক্তি কার্য্য করে না। দম, দয়া ও দান ভক্তির অঙ্গ জানিবে। যিনি জানিতে পারিয়াছেন, ভগবানের লোকাতীত গুণ, অসীম ক্ষমতা, ও অপার দয়া; যিনি জানিয়াছেন, হরি পতিত জনের উদ্ধার-কর্ত্তা, ভবসাগরের কর্ণধার, "যে খুঁজে সে পায় তাঁকে", তিনি ভক্তিভরে ইষ্টদেব জ্ঞানে হরির পদারবিন্দে লুটাইয়া পড়িয়াছেন।

ভক্তির উচ্ছ্বাসে মন অসাড় হইয়া যায়, বুদ্ধি নির্ব্বাতদীপ-শিখার ন্যায় স্থির ও নিশ্চল হইয়া থাকে।

এক দিন শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গমন করিলেন। সে সময় বিদুর গৃহে ছিলেন না। বিদুর-পত্নী স্নান করিতেছিলেন। দাসী সংবাদ দিল—শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। বিদুর-পত্নী তাড়াতাড়ি আর্দ্রবসনে, অর্দ্ধাবৃতা বেশে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন ও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরে উভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বসিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আসন দেওয়া হইল; ভগবান্ আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান্কে কিছু ভোজন করাইবেন, বিদুর-পত্নীর মনে একান্ত বাসনা; কিন্তু গৃহে ত কিছুই নাই; বিদুর যে বড় গরীব! বিদুর-পত্নী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—"হরি, আমরা যে দীনদুঃখী! ঘরে এমন কিছুই নাই যে তোমাকে দিইতে

ছিই। আমি অতি হতভাগিনী।” এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার স্মরণ হইল, পূর্ব্বদিন একটী পক্ক কলা পাইয়াছিলেন, সেটি ত খান নাই, সেটি তোলা আছে। তাড়াতাড়ি গিয়া সেই রম্ভাটি আনিলেন, এবং উহার খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলেন। বিদুর-পত্নী ভক্তিভরে পাগলিনী, বিভোরা—এ সময় তন্ময় হইয়া গিয়াছেন; রম্ভা ফেলিয়া তিনি রম্ভার “ছোপা” হরির মুখে তুলিয়া দিলেন। হরি তাহাই সুখদখাদ্য জ্ঞানে ভোজন করিলেন। ক্ষণপরে রমণীর চক্ষু রম্ভার দিকে পড়িল, অমনই তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি জিব্ কাটিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “হায়! কি করিলাম, কি হইল! হরি, দাসীর অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি জগতের রাজা। তুমি কত উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিয়া থাক। যে মুখে ক্ষীর, সর, ননী খাও, আজ কিনা আমি সেই মুখে কলার “ছোপা” তুলিয়া দিলাম! হাঃ, আমাকে ধিক! নারীজন্মে ধিক!” এই কথার পর তিনি অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হরি বিদুর-রমণীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন,—“আমি তোমার অচলা ভক্তিতেই পরিতুষ্ট হইয়াছি। ভক্ত, ভক্তিভরে আমায় যাহা নিবেদন করিয়া দেয়, আমি সাদরে তাহা গ্রহণ করি এবং ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হই। আমি প্রহ্লাদের হস্ত হইতে বিষপান করিয়াছিলাম। তুমি আমায় ভক্তিভরে কলার “ছোপা” দিয়াছ, আমি অমৃত জ্ঞানে তাহা খাইয়াছি। এখন যদি তুমি আমায় রম্ভা খাইতে দাও, রম্ভা “ছোপার” মত মিষ্ট লাগিবে না। তাহার কারণ, তুমি অনন্য-ভক্তিতে আমায় “ছোপা” দিয়াছিলে। তখন তোমার হৃদয়ে একমাত্র ভক্তিই ছিল, অন্য প্রবৃত্তিগুলি অসাড় ও নিষ্পন্দ ছিল।

এখন তোমার মনে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে কমাইয়া দিয়াছে—সে ভক্তি আর নাই, ততটা ভক্তি এখন নাই—এখন ভক্তিতে ও জ্ঞানেতে তোমার হৃদয়-রাজ্য ভাগ করিয়া লইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখন ভক্তের প্রাণে ভক্তির উৎস ছুটে, তখন তাহার মন ও বুদ্ধি নিশ্চল থাকে, কোন কার্য্য করে না।

গোপিনীদের বস্ত্রহরণ আর কিছুই নহে, কেবল ভক্তি-তত্ত্বের একটী রূপক। ইহার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। ইহাতে পাপ-কথা মনে আসিবার কোন কারণ নাই। গোপিনী=ভক্তির প্রতি-মূর্ত্তি। গোপিনীগণ অর্থে ভক্তবৃন্দ বুঝিতে হইবে। বস্ত্র=মায়া-বন্ধন। বেদান্তে বলে, অজ্ঞানের দুই শক্তি আছে—একটির নাম আবরণ শক্তি, আর একটির নাম বিক্ষেপ শক্তি। ভগবান্ মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত আছেন, সেইজন্য জীব, ভগবানকে দেখিতে পায় না, জানে না ও চেনে না। এই মায়ার আবরণ উদ্ঘাটিত হইলে পর, জীব ভগবান্‌কে দেখিতে পায়। সেই মায়ারূপ বসন হরণ করিতেছেন শ্রীহরি। মায়া কাটিয়া গেল, আর অমনই ভক্তগণ ভগবান্‌কে দেখিতে পাইলেন। এই হইল বস্ত্রহরণের তাৎপর্য্য। যদি ভগবানের দর্শনলাভ করিতে বাসনা থাকে, তবে অনন্যভক্তিতে তাঁহাকে ভজনা কর। যতকাল মায়া থাকে, ততকাল মন ও বুদ্ধির বিকার থাকে। যত দিন মনের ও বুদ্ধির বিকার থাকে, ততদিন ভক্তি স্থান পায় না। গোপিনীদের মায়া ছিল, মনের ও বুদ্ধির বিকার ছিল, লজ্জা ও ভয় ছিল, তাই অঙ্গে বস্ত্র ছিল। ভক্তির উদ্রেকে কোন জ্ঞান থাকে না, লজ্জা ও ভয় থাকে না। ভক্তি রাজ্যে সরলতার বিজয় আসর। পিতার সমক্ষে শিশু সন্তানে

অনাবৃত দেহেই থাকে। যদি স্বর্গবাস কামনা কর, তবে শিশু-সন্তানের সরল ও পবিত্রভাব শিক্ষা কর। যদি সালোক্য ও সান্নিধ্য মুক্তি চাও, তাহা হইলে সরলতা দেখাও। শ্রীহরির করে আত্ম-সমর্পণ কর। শিশু-সন্তান পিতার নিকট কিছুই গোপন রাখে না, তুমিও ভগবানের নিকট কিছুই লুকাইও না।

গুরু ও শিষ্য।

(১৩)

শিষ্য কে?—যাহার গুরুতে ঐকান্তিক ভক্তি, ইষ্ট দেবের প্রতি অচলা ভক্তি, শাস্ত্রে দৃঢ়ভক্তি, সেই ব্যক্তি উপযুক্ত শিষ্য। যে ব্যক্তি নিষ্কাম, স্বার্থত্যাগী, দয়াশীল, বিশ্বপ্রেমিক, তিনি শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র। যিনি কষ্টসহিষ্ণু, জ্ঞানপিপাসু, সংযমী, তিনি উপযুক্ত শিষ্য। এ সমুদায় গুণ যাহার নাই, গুরু তাহাকে উপদেশ দেন না, ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করেন না। পূর্ব্বকালে গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষাকালে শিষ্যকে কতই কষ্ট সহ্য করিতে হইত। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ গুরু পাইবার পূর্ব্বে কতই ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। মনের দৃঢ়তা, একাগ্রতা, যত্ন, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা, এ সকল গুণ তাঁহাদের ছিল। গুণ যে ছিল, ইহার পরিচয় দিলে পর, গুরু তাঁহাদের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গুরু কে?—আদি গুরু ভগবান্। তিনি সর্ব্বপ্রথমে সনকাদি-গণকে মন্ত্র দিলেন; মহর্ষিরা ঋষিদের মন্ত্র দিলেন; ঋষিরা দ্বিজ-

শত্রুকে মন্ত্র দিলেন ; বিশ্বামিত্র অপর জাতিকে মন্ত্র দিয়েছেন ও দিতে-ছেন। আর্য্যগণ গুরু পরম্পরায় দীক্ষা-কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। যিনি ঐহিক ও পারত্রিকের কর্ত্তা, তিনি গুরু। যিনি ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার, তিনি গুরু। যাঁহার সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান, তিনি গুরু। যিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তিনি গুরু। যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ, তিনি গুরু। যাঁহার দত্ত-মন্ত্র সঞ্জীবনী-শক্তিবিশিষ্ট, তিনি গুরু। যাঁহার প্রেম বিশ্বজনীন, তিনি গুরু। যিনি ভব-সাগরের কর্ণধার, তিনি গুরু।

গুরুর নিজ-শিক্ষা বা আত্মোন্নতি।

যিনি গুরু, তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরের সম্পূর্ণ উন্নতি করিয়াছেন। অকার উকার ও মকার ভেদ করিয়া অর্দ্ধমাত্রা-বস্থাতে গুরু উন্নীত হইয়াছেন। যে ধর্ম্ম-জ্যোতি, যে জ্ঞান-দীপ্তি, যে দৈব-প্রভা পূর্ব্বে অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ ছিল, এখন তাহা উজ্জ্বল শিখাতে পরিণত হইয়াছে। যিনি পূর্ব্বে সাধারণ বিপ্র ছিলেন, পরে দীক্ষিত সন্ন্যাসী হন, তাহার পর ঋষি হন, এখন তিনি মহর্ষির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন তিনি অসীম শক্তিশালী, ত্রিকা-লজ্ঞ, জীবন্মুক্ত। তিনি মন্ত্রকর্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি ও সংহারশক্তি-সম্পন্ন। তাঁহার আত্মা কারণ-শরীরে "হংস" পদবী লাভ করিয়া-ছিল। পরে neutral barrier অতিক্রম করিয়া দৈবীপ্রকৃতির স্থানে উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সেই আত্মা "পরমহংস" পদবী লাভ করিল। "হংস"=অহং সঃ (আমি সেই ব্রহ্ম)। "পরম-হংস"=সঃ অহং=সোঽহং (সেই ব্রহ্মই আমি)। সেই মহাত্মা জীবের মৃত্যুকালে, পিতৃলোক ও স্বর্গলোকে বিচরণ করিতে পারে। কেহ কেহ এতদূর উন্নতি করিয়াছেন যে, তাঁহারা

দেহ পরিবর্ত্তন না করিয়া, কিম্বা আবিষ্ট না হইয়া, অর্দ্ধবাহ্যাবস্থাতে উন্নীত হইতে পারেন। কেহ কেহ ঊর্দ্ধমার্গে গমন করেন, কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এই দুঃখময় সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসেন।

গুরু শিষ্যে সম্বন্ধ কিরূপ?

গুরুর সহিত শিষ্য অতি পবিত্র সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এ সম্বন্ধ দুই এক দিনের তরে নহে, দুই এক বৎসরের তরে নহে, দুই এক জন্মের তরে নহে, এ সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের জন্য। এ সম্বন্ধ যে কেবল ঐহিক সম্বন্ধ, এমত নহে; ইহা ঐহিক ও পারত্রিক সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ-শৃঙ্খল অচ্ছেদ্য। দেশ, অবস্থা ও কালের প্রভাব, এ নির্ম্মল সম্বন্ধের উপর নাই। শিষ্য কি গুরু খুঁজিয়া লইবেন? না, না, গুরুই শিষ্যকে খুঁজিয়া লইবেন। দীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে, হৃদয়কবাট খুলিয়া গেলে, গুরু স্বয়ং আসিয়া শিষ্যকে দর্শন দিবেন। গুরু, শিষ্যের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি জানিবেন। শিষ্যও গুরুকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে। গুরুর স্কন্ধে শিষ্যের সমুদয় ভার; শিষ্যের দায়িত্ব গুরুকে লইতে হইবে। শিষ্যের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে, গুরু সতত লক্ষ্য রাখিবেন।

ইষ্ট মন্ত্রে দীক্ষা ও তাহার ফল।

ডাক্তারগণ স্থির করিয়াছেন, সাত বৎসর পরে মানুষের আকার, গঠন, প্রকৃতি, প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়। মানব সাত বৎসরান্তর নব-জীবন লাভ করে। তাহাতে পুরাতন কিছুই থাকে না, কলেবর নূতন হয়। প্রতি পলে দেহের ক্ষয় হইতেছে, প্রতি পলেই সেই ক্ষতি পূরণ হইতেছে। দেহে নূতন পেশী, নূতন রক্ত-কণিকা,

নূতন ত্বক, সকলই নূতন হয়। এই নূতন কলেবর হইতে সাত বৎসর লাগে। সেই জন্য সাত বৎসরের পরে উপনয়ন সংস্কারের বিধি। দীক্ষিত হইলে পর, নরদেহে নবজীবন লাভ হয়; পুরাতন পেশী, পুরাতন কণিকা, পুরাতন ত্বক চলিয়া যায়। সেই সঙ্গে কুপ্রবৃত্তিগুলিও চলিয়া যায়। ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ধর্ম্ম-ভাবের উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে নূতন পেশী, নব কণিকা, নূতন ত্বক প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে, আর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলিরও ক্রমঃ সঞ্চার হইতে থাকে।

মন্ত্রদানের পূর্ব্বে গুরুর জানা চাই, শিষ্যের উপাস্যদেবতা কে? যে দেবতার যে ব্যক্তি বিশেষ ভক্ত, যে দেবমূর্ত্তি যাহার দেখিতে ভাল লাগে, সেই দেবতা ও সেই দেবমূর্ত্তি সেই ব্যক্তির ইষ্টদেবতা। এ কথাটী আগে গুরুর জানা চাই। এ কথা জানিয়া, গুরু শিষ্যকে মন্ত্রদান করিবেন। মনে কর, গুরু কোন শিষ্যকে কৃষ্ণ-মন্ত্র দিলেন, আর সেই শিষ্য রামভক্ত। এ স্থলে মহা বিপদ উপস্থিত। এক ঘরে দুই ভাই। দুই ভায়ের হয় ত দুইটি পৃথক মন্ত্র। এক বীজে হয়ত আটটী, অপর বীজে হয়ত পাঁচটী অক্ষর আছে, অথচ একই দেবতা। সেই দেবতার দুইটী নাম—পদ্মপলাশলোচন, আর রাধাবল্লভ।

গুরুর প্রয়োজন আছে কি না?

নিম্ন স্থান হইতে এক লম্ফে উচ্চ স্থানে উঠা যায় না। উঠি-বার জন্য সিঁড়ি চাই, ধাপ চাই; ধাপে ধাপে পা দিয়া একটু একটু করিয়া উঠিতে হয়। পথ দেখাইবার লোক চাই। যাইতে যাইতে যদি তুমি পড়িয়া যাও, কে তোমার হাত ধরিয়া তুলিবে বল? অতএব এক জন সামর্থ্য সম্পন্ন লোকের আবশ্যক। এই জন্য গুরুর

নিতান্ত প্রয়োজন। যদি প্রয়োজনই না থাকিবে, তবে শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিকট দীক্ষিত হইবেন কেন? ধ্রুব নারদের নিকট দীক্ষিত হইবেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ শাণ্ডিল্যের নিকট দীক্ষিত হইবেন কেন? যিশু জন্ দি ব্যাপ্টিষ্টের নিকট দীক্ষিত হইবেন কেন? গুরুর প্রয়োজন আছে বৈ কি। গুরু না থাকিলে শ্রীহরির পাদপদ্ম তোমাকে কে দেখাইয়া দিবে? তুমি অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছ, গুরু বিনা কে তোমাকে দিব্যচক্ষু দিবেন? কে তোমার তমোরাশি বিদূরিত করিবেন? অতএব গুরুর নিতান্ত প্রয়োজন। ভগবান্ হইলেন "তৎ" আর তুমি হইলে "ত্বম্"। বৈকুণ্ঠে আছেন "তৎ", মর্ত্তধামে রহিলে "ত্বম্"। "তৎ"এর সহিত "ত্বম্"এর মিলন চাই। সেই মিলনের নাম নির্ব্বাণ-মুক্তি, মোক্ষ। এ যোগ, এ মিলন, এ সম্বন্ধ কে ঘটাইয়া দিবে? ঘটক চাই। কে সে ঘটক? ঘটক গুরুদেব। তাঁহার হস্তে "অসি" অর্থাৎ মায়া-ডোর কাটিবার জন্য খড়্গ। এক ধারে "তৎ", অপর ধারে "ত্বম্", মধ্যে "অসি" রাখ। এখন চক্ষু মেলিয়া দেখ কি হইল—

তৎ—অসি—ত্বম্।

এই যে অতি গূঢ় "তত্ত্বমসি" তত্ত্ব, তোমায় কে শিখাইবেন? উত্তর—গুরুদেব। অতএব গুরুর বিশেষ প্রয়োজন আছে।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা—

ইংরাজি শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে দেখা যায়, সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহারা তাঁহার নিকট মন্ত্র লইবার জন্য ছোটে। এটা বড় ভ্রম, কেবল ভ্রম নহে, অনিষ্টপাতেরও মূল। কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী, দণ্ডী, বা ব্রহ্মচারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে স্থবির মঙ্গল নাই। কারণ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কেহ কাহারও পরিচিত

নহে। গুরু, শিষ্যের প্রকৃতি ও ক্ষমতা জানিলেন না; শিষ্যও গুরুর গুণের কোন পরিচয় পাইলেন না। গৃহী শিষ্য, গৃহী গুরুর আশ্রয় লইবেন। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সন্ন্যাসী-গুরু মন্ত্র গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন, "ভাল গুরু পাই না, এজন্য দীক্ষিত হই না।" এটা দম্ভের কথা। দম্ভ ত্যাগ করিয়া নতশিরে কুলগুরুর পদাশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইবে। তিনি যে নিয়ম বলিয়া দিবেন, তাহা পালন করিতে হইবে। কুল-গুরু মহাপণ্ডিত না হইতে পারেন, শাস্ত্রবিশারদ না হইতে পারেন, বেদবেদান্তদর্শন না জানিতে পারেন, কিন্তু তোমার পরকালের জন্য যেটুকু আবশ্যক, সে জ্ঞান তাঁহার আছে, সে জ্ঞান তিনি তোমাকে অনায়াসে দিতে পারেন। সার কথায় দুই এক বর্ণ যাহা তিনি জানেন, তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বা অন্য কোন কারণে যদি তোমার দীক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটে, উদ্দেশে গুরুকে ডাকিবে। যতদিন না গুরু আসিয়া উপস্থিত হন, ততদিন তুমি মুখে বলিতে থাক—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

জীবনের ধ্রুবতারা।

(১৪)

দুইটী পথিক চলিয়াছে। উভয়েরই গন্তব্য স্থান একই নগরী। এক জন সেই নগরবাসী; অপর ব্যক্তি বিদেশীয় লোক। যে নগরবাসী, সে পরিচিত পথ ধরিয়া চলিয়াছে; আর যে বিদেশীয়, সে ব্যক্তি অপরিচিত পথে গমন করিতেছে। এক জনের পথ সুগম—সোজা; অপরের পথ দুর্গম—বাঁকা। এক জন অল্প সময়ের মধ্যেই নগরীতে পৌঁছিবে; অপর লোকটির নগরে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবার কথা। সেইরূপ, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া দুই জন লোক যদি দুইটী বিভিন্ন ধর্ম্ম-মার্গ অবলম্বন করিয়া চলে, তাহা হইলে এক জন ঘুরিয়া বেড়াইবে, আর এক জন অতি শীঘ্র আপন লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত হইবে। উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য এক। সেই লক্ষ্য কি? সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সুখই জীবনের ধ্রুবতারা। সেই সুখের উদ্দেশে জীবকুল ছুটিতেছে—অনন্তকাল ধরিয়া ছুটিতেছে, সে গতির বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। সে সুখ কি প্রকার? কিসেই বা সুখ পাওয়া যায়?

কেহ বলেন, সংসারাশ্রমে সুখ। কেহ বলেন, সংসারাশ্রমে সুখ নাই, সন্ন্যাসাশ্রমে সুখ। কেহ বলেন, ইহকালে সুখ নাই, পরকালেই সুখ। কেহ বলেন, বাসনা ও কামনা পরিতৃপ্তিতে সুখ। কেহ বলেন, বাসনা ও কামনা পরিত্যাগেই সুখ। কেহ বলেন, নির্ব্বাণে সুখ। কেহ বলেন, কর্ম্ম-মার্গে সুখ। কেহ বলেন, জ্ঞানমার্গে সুখ। কেহ বলেন, ভক্তিমার্গে সুখ। কেহ বলেন, কোন

মার্গেই সুখ নাই, শূদ্র হইয়া শূদ্রে মিশিয়া যাইতে পারিলেই সুখ। কেহ বলেন, সুখ দুঃখ আবার কি? সুখ দুঃখ কল্পনার ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র। কেহ বলেন, সাযুজ্য-মুক্তির নাম সুখ—জীবব্রহ্মের একত্বে সুখ। কেহ বলেন, "আমি বিন্দু, ব্রহ্ম সিন্ধু, তবে একত্ব কোথায়? বিন্দুর সাধ্য কি যে সিন্ধু হয়; বিন্দু সিন্ধুর সমান, সিন্ধুতে বিন্দুতে এক, ইহা বাতুলের কথা।" কেহ বলিতেছেন,—আমি তাঁহার সঙ্গে এক হইতে চাহি না, আমি দাস, তিনি প্রভু; আমার একমাত্র আকিঞ্চন, চিরদাস হ'য়ে সেই রাঙ্গা পদ সেবিব, সেই পদে লুটাইব। সেবা করাতে সুখ, একত্বে সুখ নাই, পৃথকত্বে সুখ।

বিভিন্নলোকের প্রকৃতি বিভিন্ন, রুচিও বিভিন্ন। এক জন ধনবান্ ব্যক্তি মনে করে সাংসারিক সুখই পরম সুখ। সে জন্য সে ব্যক্তি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ বিলাসের সামগ্রী ক্রয় করে। ইন্দ্রিয় সেবাকে সে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান করে। ইন্দ্রিয় সেবাতে জীবন কাটায়; কিন্তু তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, সে সুখী হইতে পারে না।

আর এক ব্যক্তি ধনসম্বৃদ্ধিহীন বটে, কিন্তু পণ্ডিত, সর্ব্ববিদ্যাতে বিভূষিত। তিনি মনে করেন, জ্ঞানার্জ্জনেই পরম প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিত যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন, পুস্তক ক্রয়ে তাহা ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না; তিনি সুখী হইতে পারেন না।

আর এক ব্যক্তি অতি ধর্ম্মপরায়ণ। আত্ম-সংযমী, আত্ম-ত্যাগী, তিনি মনে করেন, ভগবচ্চিন্তাতে পরম সুখ, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। নির্ম্মল সুখের অন্বেষণে তিনি নিস্বার্থভাবে পরের উপকার

করেন, এবং আপন ইষ্টদেবের ধ্যান করেন। তাঁহার বাসনা চরিতার্থ হয়, তিনি বিপুল আনন্দ উপভোগ করেন।

এখন দেখা গেল, সকলেই একবাক্যে বলেন যে, সুখ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই সুখের অন্বেষণে ভিন্ন লোক ভিন্ন পথে চলিয়াছে। সুখের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। লক্ষ্য এক বটে, কিন্তু উপায় ভিন্ন প্রকার। ইহার মধ্যে কোন্‌টী সহজ উপায়, কোন্‌টী কঠিন; কোন্‌টী সুগম পথ, কোন্‌টী দুর্গম পথ; কোন্‌টী সরল, কোন্‌টী জটিল; কোন্‌টী সুখসাধ্য, কোন্‌টী কষ্ট-সাধ্য; কোন্‌টী প্রশস্ত, কোন্‌টী অপ্রশস্ত, এই কথার মীমাংসা করিতে হইবে। এ কথার মীমাংসা করিতে হইলে, Evolution Theory বা ক্রম-বিকাশ তত্বটা সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হয়।

শরীর ত্রিবিধ—স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। পঞ্চকোষ—অন্নময়, প্রাণময়, জ্ঞানময়, মনোময়, আনন্দময়।

প্রথম—স্থূল শরীর।

এই দেহ অস্থিমাংসে গঠিত। এই স্থূলদেহে আমরা সুখ দুঃখ বোধ করিয়া থাকি। এই দেহকে অন্নময়কোষ বলে; ইংরাজি নাম, Physical body.

দ্বিতীয়—সূক্ষ্ম শরীর।

এই দেহে প্রজ্ঞা, কল্পনা, স্মৃতি, বিবেক, স্মৃতি এই সকল মানসিক শক্তি আছে। মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষ দ্বারা সূক্ষ্ম-শরীর গঠিত; ইংরাজি নাম, Intellectual body.

তৃতীয়—কারণ শরীর।

কারণ শরীরের অপর নাম আনন্দময়কোষ। এই কোষের

অভ্যন্তরে চৈতন্য-শক্তি আছেন। তাঁহার নাম সূক্ষ্মাত্মা বা Spirit; এই দেহের ইংরাজি নাম, Spiritual body.

এই যে ত্রিবিধ দেহের কথা বলিলাম, এই দেহত্রয় সত্ব, রজ ও তমগুণে জড়িত। এই দেহত্রয় উপাধিমাত্র, এবং জীবাত্মা, ব্যষ্টি উপহিত চৈতন্য। উপাধির দোষে বা গুণে, জীবাত্মা কখন মলিন—দীপ্তিশূন্য; কখন বা নির্ম্মল—বিশুদ্ধ-সত্ব বলিয়া বোধ হয়। উপাধির গুণে আত্মার উন্নতি, এবং উপাধির দোষে আত্মার অবনতি হইতে দেখা যায়। হিন্দুরা জন্মজন্মান্তরের কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দুর মত এই—প্রাণত্যাগ কালে, আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে চলিয়া যায়। জীব নানা দেহ ভ্রমণ করে, নানা যোনি প্রাপ্ত হয়। এই গতাগতিতে জীবের যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহা সঞ্চিত থাকে, নষ্ট বা ক্ষয় হয় না। সেই সঙ্গে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল এবং অতৃপ্ত বাসনাদি পরজন্মের জন্য সঞ্চিত থাকে। সে জ্ঞানের লয় হয় না, সে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, সকলই তোলা থাকে, সকল কথাই মনে গাঁথা থাকে। জীব সে সকল পূর্ব্বের কথা বিস্মৃত হয় না। এ কথার প্রমাণ এই যে, দেহের কিঞ্চিৎ উপর দিয়া বার বার কর-সঞ্চালন করিলে অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই প্রক্রিয়ার নাম Mesmerism বা Hypnotism। এইরূপ মূর্চ্ছিত অবস্থাতে জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহের মনোময়কোষে গমন করিয়া থাকে। সে সময়ে স্থূল দেহটা অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকে। এই অবস্থাতে মানসিক বৃত্তিগুলি কার্য্য করিয়া থাকে, এবং মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। দেখা গিয়াছে, সেই ব্যক্তির কেবল যে এক জন্মের কথা স্মরণ আছে

এমন নহে, পূর্ব্বজন্মের সকল জন্মের কথাই সে আনে ও বলিতে পারে। জিজ্ঞাসা করাতে মূর্চ্ছিত ব্যক্তি অনেক অদ্ভুত কথা বলিয়াছে; কেবল এক জন্মের কথা নহে, বহু জন্মের কথা।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। সৎকর্ম্ম কর, সদ্গতি হইবে; অসৎকর্ম্ম কর, সদ্গতি হইবে না। অসৎ কর্ম্মে দুঃখ ভোগ, ইহাকেই বলে কর্ম্মপাশ। কর্ম্মসূত্রে জীব বাঁধা আছে। এই কর্ম্মফলে তুমি ধনী, আর আমি দরিদ্র; তুমি অতুল সুখভোগ করিতেছ, আর আমি অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছি। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে এক ব্যক্তি কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত, গলিতচর্ম্ম, অন্ধ, খঞ্জ, বধির, আর এক জন তপ্তকাঞ্চননিভ তেজঃপুঞ্জের আধার নির্ব্যাধি দেহে সুখে আছেন। এই কর্ম্মফলে কাহারও একে একে দশটী পুত্র নষ্ট হইয়াছে, আবার কাহারও পুত্র-পৌত্রে ও ধনরত্নে সোণার সংসার জাজ্বল্যমান। এই কর্ম্মসূত্রে এক ব্যক্তি যোগী, আর এক ব্যক্তি ভোগী; এক জন সম্রাট, আর এক জন পথের ভিখারী; এক জনের ভাগ্যে চিরশান্তি, আর এক জনের ভাগ্যে নিরন্তর অশান্তি। এই কর্ম্ম-ফলে এক জনের ভাগ্যে স্বর্গ, আর এক জনের ভাগ্যে পুন্নাম নরক।

কর্ম্মসূত্রে সংসার বাঁধা। প্রকৃতি, রুচি, ধারণা, জ্ঞান এই চারিটী কর্ম্মের মূল। ইহার অর্থ এই—তোমার যেরূপ প্রকৃতি বা রুচি, তুমি সেইরূপই কর্ম্ম করিবে; তোমার যেরূপ জ্ঞান ও ধারণা, তুমি সেই প্রকার কার্য্য করিবে। আমার যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ ধারণা, যেরূপ প্রকৃতি, যেরূপ রুচি, আমি সেইরূপই কার্য্য করিব। তোমরা যেরূপ কর্ম্ম করিব, আমাদের গতিও সেইরূপ হইবে। কর্ম্ম করিলেই পুনঃ পুনঃ সংসারে কিনিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইবে। কর্ম্মকে

আশ্রয় করিয়া পুনর্ব্বার ঘুরিতেছে। জন্মের পর জন্ম, আবার জন্ম, এইরূপ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। নিরন্তর অনিবার্য্য স্রোতে জীব-ফুল ভাসিয়া চলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে? চলিয়াছে সেই অনন্ত-সাগরের অনন্ত নীরে। অনন্ত সুখের উদ্দেশে জীব-ফুল ভাসিয়া চলিয়াছে। সে অনন্তসুখ, সে অপার শান্তি কোথায়?—আনন্দ পারাবারে। ক্ষুদ্র তটিনী অনন্ত রত্নাকরে পড়িবে, তাহাতেই মিশিবে, মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। এই মিলনে সুখ, এই মিশ্রণে শান্তি, এই একত্বে অপার আনন্দ। জীব-ব্রহ্মের মিলনে ও একত্বে অনন্ত-সুখ, অপার শান্তি। যে মহাত্মা জীব-ব্রহ্মের একীভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি সুখ ও শান্তি পাইয়াছেন। ক্রমবিকাশতত্ত্বের চরমফল এই—জীব, জন্ম জন্ম উন্নতিমার্গে উঠিতেছে, এবং উন্নতির চরম সীমাতে উঠিলে পর বুঝিবে, জীব ও ব্রহ্ম এক। কিন্তু এই অভেদ-জ্ঞান সহজে জন্মে না। এ অভেদ-জ্ঞানের উদয় বহুকালের সাপেক্ষ, বহু জন্মের সাপেক্ষ, বহু সুকৃতি-ফলের সাপেক্ষ। বুদ্ধির বিকাশ, জ্ঞানের বিকাশ ক্রমশঃ হইয়া থাকে। শিক্ষায় স্তর আছে, ক্রম আছে, পর্য্যায় আছে। কেহ কখনও এক উদ্যমেই উন্নতির চরম সীমাতে উঠিতে পারে না। এ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে।

ইন্দ্র এক দিন প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন। তাঁহার সহিত দুইটী অসুরও গমন করিল। দেবরাজ প্রণাম করিয়া প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! বলিয়া দিউন, ব্রহ্ম কোথা বসতি করেন?" প্রজাপতি কহিলেন,—"দেবরাজ! নিকটে একটী বৃহৎ জলাশয় আছে। আপনি তথায় গমন করিয়া

অনিমেষলোচনে নির্ম্মল জলের উপর কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকুন, তাহা হইলেই ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবেন।" ইন্দ্র, প্রজাপতির আদেশ মত জলাশয়ের সন্নিকটে গমন করিয়া জলে নিপতিত আপন প্রতিবিম্ব অবলোকন করিলেন। অসুরদ্বয়ও নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। তাহারা নিজ প্রতিবিম্বকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিল। ইন্দ্র তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং প্রজাপতিকে কহিলেন,—"প্রভো! আমায় ছলনা করেন কেন? জলের উপরে আমি আমার প্রতিবিম্ব দেখিলাম, ব্রহ্মকে ত দেখিতে পাইলাম না।" তখন প্রজাপতি বলিলেন—"দেবরাজ! মনেই ব্রহ্ম আছেন; মনের মধ্যে অন্বেষণ করুন, তাঁহাকে পাইবেন।" ইন্দ্র বহুকাল আপন মনে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মের দর্শন পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "প্রভো! মনে ব্রহ্ম নাই।" তখন প্রজাপতি বলিলেন,—"দেবরাজ! আপনার হৃদয়ের নিভৃত স্থান খুঁজিয়া দেখুন, ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবেন।" ইন্দ্র সেই মত আপন হৃদয়ে ব্রহ্মকে খুঁজিতে লাগিলেন। বহুকাল খুঁজিতে খুঁজিতে অন্তরের অন্তরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাইলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেবরাজ প্রজাপতিকে বলিলেন,—"প্রভো! ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে। আমি চরিতার্থ হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া ইন্দ্র প্রজাপতিকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া অমরাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই শ্লোক। ইহার তাৎপর্য্য এই—(১) ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়-গ্রামের অগোচর। (২) ব্রহ্ম, মন ও বুদ্ধির অগোচর। (৩) ব্রহ্ম, অন্তরের অন্তরে আছেন। (৪) কেবল অনন্তভক্তিতে তাঁহার দর্শন মিলে।

ভক্তিমার্গে গমন করিলে তাঁহার দর্শনলাভ হয়, কেবল কর্ম্মমার্গে বা জ্ঞানমার্গে গেলে তাঁহার দর্শনলাভ হয় না।

কিন্তু সে ভক্তি অচলা হওয়া চাই, ভক্ত অনন্তভক্তি হইবে; সে ভক্তির মূলে অন্ধবিশ্বাস থাকে, সেও ভাল, তথাপি সে ভক্তিতে যেন সংশয়ের ছায়া না পড়ে; সে ভক্তিতে বিশুদ্ধ প্রীতি ও সুমধুর প্রেম বিজড়িত থাকিবে। কিন্তু হায়! আমরা এ পাপময় সংসারে পড়িয়া আছি। আমাদের এ বিদগ্ধ-হৃদয়ে, সে বিশুদ্ধ ভক্তি, সে বিশুদ্ধ প্রীতি কোথায়? এ বিশুষ্ক—বিদগ্ধ-হৃদয়ে কে শান্তি-বারি ছিটাইবে বল? আমাদের ভক্তি অন্তঃসার শূন্য, আমাদের প্রীতি স্বার্থের কলঙ্কে কলঙ্কিত। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা, সন্তান সন্ততির প্রতি পিতা মাতার ভালবাসা, এ তিন প্রকার ভালবাসাতেই আত্ম-সুখের ও আত্ম-তৃপ্তির তৃষ্ণা রহিয়াছে।

আত্ম-সুখ ও আত্ম-তৃপ্তির তৃষ্ণা আছে বলিয়াই আমরা প্রিয়-জনকে ভালবাসিয়া থাকি। এ ভালবাসা নিঃস্বার্থ ভালবাসা নহে, এ ভক্তি নির্ম্মল নহে, এ প্রীতি নিষ্কলঙ্ক নহে, এ প্রেম নিষ্কাম প্রেম নহে। যে দিন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিবে, যে দিন আত্ম ভুলিতে পারিব, যে দিন আত্মকে বিরাট আত্মে মজ্জিত করিতে পারিব, সে দিন বুঝিব আত্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। যে দিন আত্মকে জগতময় দেখিব, সেই দিন নিষ্কাম প্রেমের সঞ্চার হইবে—সেই দিন প্রেমানন্দের লহরী ছুটিবে।

প্রথিতনামা কোন মুসলমান কবি, উপন্যাসের ছলে অচলা ভক্তি ও নিষ্কাম প্রীতির কথা বুঝাইয়াছেন। গল্পটী ক্ষুদ্র হইলেও হৃদয়গ্রাহী বটে।

এক যুবকের সহিত কোন যুবতীর প্রণয় হইল। উভয়ে কিছু কাল সুখে অতিবাহিত করে। পরে কোন কারণ বশতঃ উভয়ের মনোমালিন্য ঘটে। এই ঘটনার পর যুবতী যুবককে আর প্রীতি-নেত্রে দেখিত না। কিন্তু যুবক, যুবতীর রূপে ও গুণে বিমুগ্ধ। এক দিন সেই যুবক প্রণয়িনীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল-হৃদয়ে তাহার বাটীতে গমন করিল, এবং দাসীর মুখে শুনিল—তাহার স্বামিনী নিজ কক্ষে বসিয়া আছে, এবং বলিয়াছে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। তখন সেই যুবক উক্ত কক্ষের দিকে গমন করিয়া দেখিল, কক্ষের দ্বার রুদ্ধ আছে। সে অনেক বার যুবতীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু যুবতী কোন উত্তর দিল না। শেষে সজোরে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে যুবতী বলিল,—"কে ও, দ্বারে করাঘাত করিতেছে?" যুবক উত্তর দিল,—"আমি—তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, দ্বার খুলিয়া দেও।"

যুবতী দ্বার খুলিল না। রোষভরে বলিল,—"তুমি চলিয়া যাও, দ্বার আমি খুলিব না।"

এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া যুবক মর্ম্মাহত হইল, এবং লজ্জা ও ক্ষোভে সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিল। এই ঘটনার পর যুবকের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। যুবক ফকির হইলেন। তাঁহার কটিতে কৌপিন, মস্তকে জটাভার, হস্তে দণ্ড, অঙ্গে বিভূতি। ফকিরের বেশে দেশ বিদেশে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; রাত্রিতে বৃক্ষের তল আশ্রয়, দিবসে ভ্রমণ। ঘটনাক্রমে এক দিন সেই ফকির ঐ রমণীর বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। পূর্ব্বের কথা স্মরণ হইল। মনে ইচ্ছা হইল, একবার রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করে। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনিল রমণী আপন কক্ষে

বসিয়া আছে। এবারও দ্বার অর্গল-বদ্ধ। ফকির পূর্ব্বের ন্যায় ডাকাডাকি করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না; শেষে দ্বারে করাঘাত আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ শব্দ করার পর রমণী জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? কেন বার বার দ্বারে আঘাত করিতেছ?" ফকির উত্তর দিল,—"I am thyself"—আমি তোমা বই আর কেহ নই। তুমিই সেই আমি—আমি অন্য কেহ নহি।"

রমণী এই কথা শুনিবামাত্র দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল, এবং অজস্র-ধার অশ্রুনীরে তাহার চরণযুগল অভিষিক্ত করিল। এতদিনের পর তাহাদের পুনর্মিলন হইল। আহা! এই মিলন কি সুখের মিলন, কি সাধের মিলন! এটী নির্ব্বিকল্প সমাধির চিত্র। নির্ব্বিকল্প সমাধি না হইলে, জীব ও ব্রহ্মে এক, এ জ্ঞান হয় না। জীব, ব্রহ্মের একত্ব, মানব জীবনের লক্ষ্য। অতএব আইস ভাই, আমরা সেই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া চলি।

সমাপ্ত।